ছোটদের রাজমালা

অনিলকুমার চক্রবর্তী



ছোটদের রাজমালা

৪৩

অনিলকুমার চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৯০
জানুয়ারী ১৯৮৪

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

আট টাকা

ছোটদের রাজমালা

ঃ কাহিনী বিভাগ ঃ



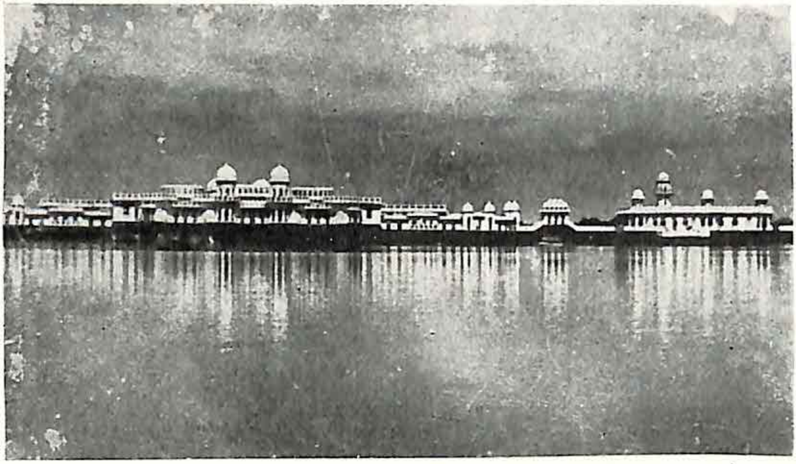
রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' খ্যাত
ভুবনেশ্বরী মন্দির



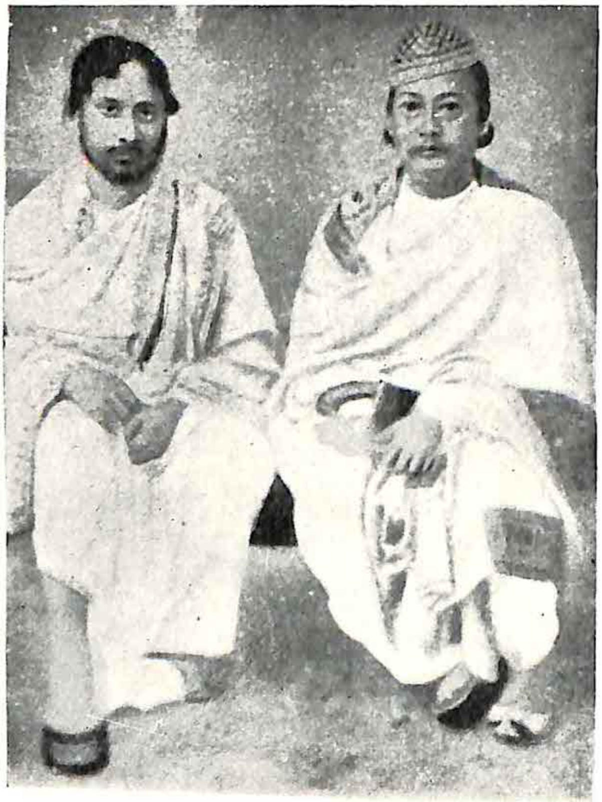
উনকোটীশ্বর শিব, উনকোটি



উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, আগরতলা



নীর মহল, মেলাঘর



রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

যযাতির কাহিনী

অনেক দিনের কথা। ভারতবর্ষে ছিলেন যযাতি নামে খুব বড়ো এক রাজা। পাঁচ ছেলে তাঁর।

রাজার বয়স হয়েছে। শরীরে নানা অসুখ বিসুখ। তাই সব ছেলেকে কাছে ডাকলেন যযাতি। বললেন, "আমার এই অসুখ বিসুখ তোমরা যদি কেউ নিজের শরীরে নিয়ে নাও, যদি তোমরা যোগবলে ভোগো আমার রোগ তবে আমি আবার ভালো হয়ে উঠি, আরো অনেকদিন রাজা হয়ে থাকি মনের সুখে।"

কে আর অসুখ বিসুখ নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে চায়? কেউ রাজী হতে চায় না রাজার কথায়। রাজা যযাতি মনে বড়ো বেদনা পেলেন।

পুরু সবার ছোটো ছেলে। বাবাকে খুব ভালোবাসতো সে। এগিয়ে এলো পিতা যযাতির সামনে। বললো, "আমি নেবো তোমার সব অসুখ আমার দেহে। তবু তুমি ভালো হয়ে ওঠো।"

ছোটো ছেলের কথায় রাজা খুব খুশী। তিনি তাঁর রাজ্যের সব চাইতে ভালো অংশ দিলেন ছোটো ছেলে পুরুকে। পুরু হলেন হস্তিনার রাজা। অন্য চার ছেলেকেও চারটি জায়গার রাজা করলেন যযাতি। তবে এ-সব জায়গাগুলো ভালো নয় মোটেই। ওঁদের যেন তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন অনেক দূরে দূরে।

তাঁর তৃতীয় ছেলে দ্রুহ্যকে পাঠালেন তিনি পাহাড়ী কিরাত দেশের রাজা করে। ত্রিবেগ নগরে হল তাঁর রাজধানী। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কপিলা নদী।

● ত্রিপুর রাজার কাহিনী

এই বংশের আরেক রাজা দৈত্য। দৈত্য রাজার ছেলের নাম ত্রিপুর। কিরাত দেশেই জন্মেছে সে। তাই হাবভাব সব পেলো সে কিরাতদের। লেখাপড়া শিখলো না একটুও। ভালো কাজ কিছুই শিখলো না সে, শিখলো শুধুই মারামারি কাটাকাটি। তার কথা যে না শুনতো তারই গলা কাটা পড়তো। ত্রিবেগের আশে পাশে যে-সব রাজা ছিলেন তাঁদের সবাইকে ভয় দেখিয়ে বশ করে রাখলো সে। যেমনি তার বদ মেজাজ তেমনি তার দেমাক। নিজেকে সে দেবতা বলে মনে করতো।

এ-ভাবে অনেক বছর ধরে সে রাজা হয়ে রইল কিরাত দেশে। আর তার নাম থেকেই দেশের নাম ত্রিপুরা।

দ্বাপর যুগের শেষে শিব এলেন একদিন ত্রিবেগ রাজ্যে। ত্রিপুরের কাছে গেলেন তিনি এগিয়ে। ত্রিপুর রেগে বললো, "কে হে তুমি সাপের মালা গলায়, পালাও এখান থেকে।" শিবকে দেবতা বলে চিনতে পারলো না সে।

ভীষণ রেগে গেলেন শিব। প্রলয়ের দেবতা তিনি। সময় হলে সব ধ্বংস করে নাচতে থাকেন। ত্রিপুর রাজারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। মহাদেব মহা রেগে গিয়ে ভীষণ বেগে তাঁর ত্রিশূলখানা ছুঁড়লেন ত্রিপুর রাজার বুক লক্ষ্য করে। এদিকে বিঁধে ওদিকে বেরিয়ে গেল শিবের ত্রিশূল। ত্রিপুর রাজা শিবের মুখখানা দেখতে দেখতে মারা গেলেন। স্বর্গে চলে গেলেন তিনি। শিবের হাতে মরলে স্বর্গলাভ হয়।

এদিকে ত্রিবেগ রাজ্যের প্রজাদের তখন খুব বিপদ। দেশে অন্ন নেই। নিজেদের দেশে ভিক্ষাও জুটছে না তখন তাদের। অনাহারে

দিন কাটাচ্ছে সব দেশের মানুষ !

ত্রিবেগ রাজ্যের পাশেই হেরম্ব রাজ্য। এখন তার নাম কাছাড় জেলা। পাশের সেই হেরম্ব রাজ্যে আশ্রয় নিলো সব ত্রিবেগের মানুষ।

পরবার কাপড় নেই তাদের, গাছের ছাল পরে আছে সবাই। হুয়ারে হুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে ফেরে, সবাই ভিক্ষা দেয় না। গালাগালি দেয়। সবাই ভাবছে তখন, এ-ভাবে বেঁচে থেকে কি হবে আর, মরাই ভালো।

পাত্র মিত্র, মন্ত্রী সেনাপতি সবাই ভাবছে। ভাবছে তারা ত্রিপুরাতে আর একজন ভালো রাজার বড়ো দরকার।

ভেবে ঠিক করলো সবাই মিলে, দেবাদিদেব মহেশের পুজো দেওয়া যাক। সবাই মিলে কাতর প্রার্থনা জানানো যাক তাঁর চরণে।

পর্বতের উপরে শিবের পুজোর আয়োজন হল। পর্বতের পবিত্র ঝর্নার কুলু কুলু শব্দের সঙ্গে পাখীর ডাক মিশেছে সেখানে। ছায়া ছড়িয়েছে কতো রকমের গাছ।

কিরাতদের রীতি অনুযায়ী মহাদেবের পুজো হল। সাত দিন সাত রাত চললো সে উৎসব। বলি দেওয়া হল অনেক ছাগ, নাচ হল পাহাড়ী মাদলের তালে তালে, গানে গানে পাহাড়ের বাতাস মাতাল হয়ে শিব শিব বলে ডেকে উঠলো।

শিব তাই আর রইতে পারলেন না কৈলাসে। আশুতোষ বৃষে চড়ে রওনা দিলেন পাহাড়ী রাজ্যে। সারা শরীরে তাঁর ছাই মাখা, মাথায় জটার জাল। তাতে রয়েছেন মা গঙ্গা। পরনে তাঁর বাঘের চামড়া, গলায় সাপের মালা, কপালে আধা-চাঁদ। হাতে তাঁর শিঙা আর ডমরু, ধীরে ধীরে বাজছে। সঙ্গে চলেছে নন্দী আর ভৃঙ্গী।

পুজোর জায়গায় এসে পৌঁছলেন ভোলানাথ। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো ত্রিপুরার সকল প্রজা। হাত জোড় করে শিবের কাছে প্রার্থনা জানালো সবাই। ত্রিপুরকে তিনি মেরে ফেলবার পর থেকেই তাদের হুঃখের দিন চলছে সে-কথা জানালো তারা। সব বুঝিয়ে বললো আশুতোষকে। আর জানালো, ঠাকুর দয়া করে একজন ভালো রাজা

দাও এবারে আমাদের।

মহাদেব খুশী হলেন খুব। বললেন তিনি, "এবারে তোমাদের রাজ্যে এমন এক রাজা হবে যেন আমারই ছেলে সে। তার চেহারা হবে ঠিক আমার মতো আর স্বভাবও তেমনি। হীরাবতী নামে যে কন্যা আছে ত্রিপুরায় সে-ই হবে তার মা। তার ডাক নাম হবে 'সুবড়াই' আর ভালো নাম হবে ত্রিলোচন।"

● ত্রিলোচনের কথা

ত্রিলোচনের জন্ম হল। রাজ্য জুড়ে মহা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। মন্ত্রী, সেনা, পাত্র-মিত্র সবাই দেখতে এলো ত্রিলোচনকে। যে যেমন পারলো নতুন রাজার নামে উপহার দিয়ে গেল।

ত্রিলোচন কথার অর্থ, তিনটি চোখ যাঁর। দেবতাদের মতো তিনটি চোখ ত্রিলোচনের, সুন্দর তাঁর শরীরের গড়ন। ঠিক যেন এক দেবতা। সব প্রজারা ভাবছে, তাদের এতদিনের দুঃখ এইবারে ঘুচলো বুঝি।

বড়ো হলেন ত্রিলোচন। এবারে রাজা হবেন তিনি। মহাসমারোহে অভিষেক হল। ত্রিলোচন ত্রিপুরার রাজা হলেন। প্রতিদিন রাজ্যের নানাদিক থেকে সবাই আসছে নতুন রাজাকে দেখতে। কেউ রাজাকে ভেট দিচ্ছে সোনা-দানা, কেউ দিচ্ছে হাতী ঘোড়া ছাগল এসব পশু।

শিব, হরি আর দুর্গাকে রোজ পুজো করতেন ত্রিলোচন। মনটি তাঁর দয়া-মায়ায় ভরা। ভালো কাজের দিকে খুব ঝোঁক। শিব ঠাকুরের দয়ায় এবারে মনের মতো রাজা পেলো প্রজারা। সবার মনেই আনন্দ।

রাজা ত্রিলোচনের বয়স হল বারো বছর। ত্রিপুরার আশেপাশে যে-সব ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল তারা সবাই ত্রিলোচনকে মেনে নিল। রাজার গুণগরিমার কথা ছড়িয়ে পড়লো দেশ দেশান্তরে।

হেরম্বের রাজার কানেও গেল সে-কথা। তিনিও শুনতে পেলেন ত্রিলোচনের গুণপনার কথা। হেরম্বরাজ বুড়ো হয়েছেন। বাইরের শত্রুরা লোভ করছে তাঁর রাজ্যের উপর। আর তার আছে পরমা সুন্দরী এক কন্যা। মনে ভাবলেন, ত্রিলোচনকেই করবেন জামাতা, তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন রাজকন্যার। তখন শ্বশুর-জামাই মিলে শত্রুর হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করতে পারবেন। এমনকি পাশের রাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমা আরো বাড়াতে পারবেন।

হেরম্বরাজ একজন ব্রাহ্মণকে দূত পাঠালেন ত্রিলোচনের কাছে। নগরে এসে রাজসভায় উপস্থিত হল দূত। ত্রিলোচনকে জানালো সে, হেরম্বরাজের ইচ্ছে তাঁর কন্যা দান করেন ত্রিপুররাজকে। এ সংবাদে রাজ্য জুড়ে আনন্দের বান ডাকলো।

শুভদিনে ত্রিলোচন যাত্রা করলেন হেরম্বরাজ্যে। সঙ্গে চললো বরযাত্রীর দল। চললো অনেক রাজা, মন্ত্রী, সেনা, সেনাপতি; চললো কিরাত কিরাতী, কতো হাতী ঘোড়া, গায়ক বাদক। মানুষ আর জানোয়ার জন্তুর বিশাল মিছিল চললো ত্রিপুরা থেকে হেরম্বে।

দিন কতক পথ চলতে হল সকলের। শেষে পৌঁছলো সবাই হেরম্বরাজ্যে। কোনো এক প্রভাত বেলায় হেরম্বরাজের সঙ্গে দেখা হল ত্রিলোচনের। চাতকপাখী যেন বৃষ্টির জল পেয়ে শীতল হল, এমনি আনন্দ হল হেরম্বরাজের। এ রাজ্যের পাত্র মিত্র আর প্রজারা সব এগিয়ে এসে বরণ করে নিল ত্রিলোচনকে। মানুষের মিছিলের মাঝে রূপবান রাজা ত্রিলোচনকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য তারার মাঝে শোভাময় চাঁদ।

হেরম্বরাজ বয়সে অনেক বড়ো। ত্রিলোচন তাই নমস্কার জানালেন তাঁকে। তিনিও নিজের ছেলের মতো আদর যত্ন করলেন ত্রিলোচনের।

শুভক্ষণে বিয়ে হয়ে গেল। ন'দিন ন'রাত ধরে চললো বিয়ের ধুমধাম। দিনরাত চললো নাচ, গান আর ভোজ। দু'দেশের নানা রকমের বাজনায় ভরে রইল হেরম্বের আকাশ বাতাস।

ত্রিলোচন বিয়েতে পেলেন অনেক ধন-রত্ন, হাতি-ঘোড়া আর দাস-দাসী। নতুন বৌ নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন ত্রিলোচন। ত্রিপুরায় আবার আনন্দের উৎসব হল।

কিছুদিন পরে রাজা ত্রিলোচনের রাজ্য আলো করে জন্মালো এক পুত্র। সে খবর পৌঁছলো গিয়ে হেরম্ব রাজ্যে। হেরম্বরাজ আদর করে নাতিকে নিয়ে গেলেন নিজের রাজ্যে। ত্রিলোচনের বড়ো ছেলে সেখানেই মানুষ হতে লাগলো।

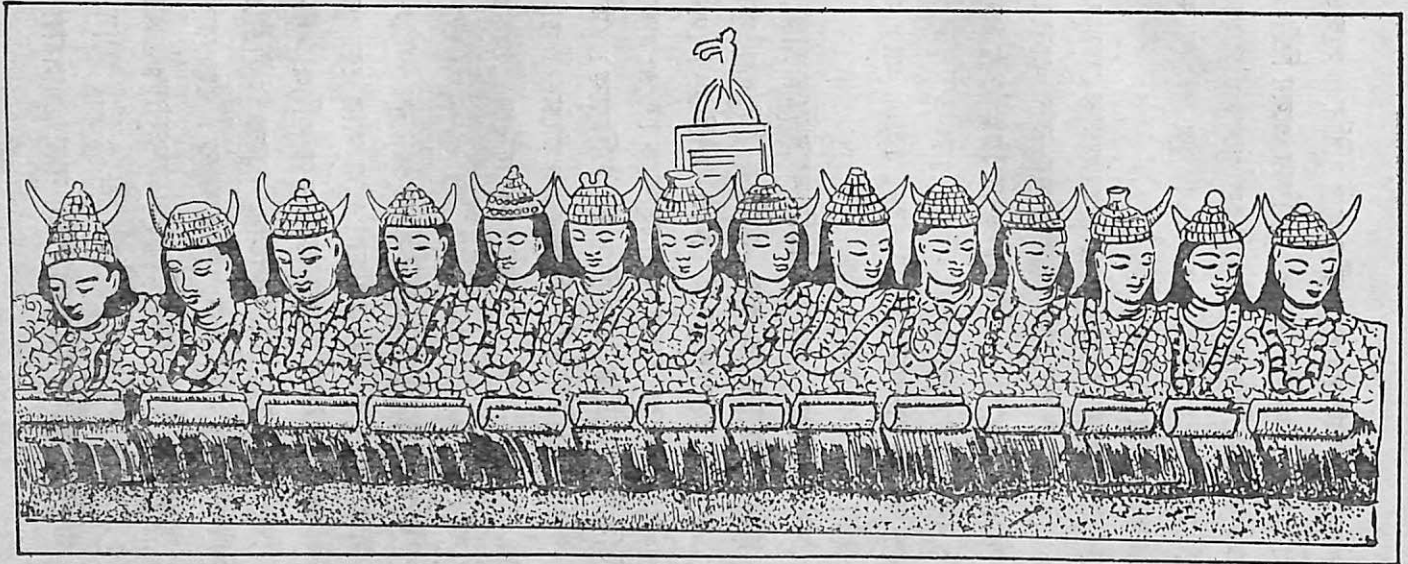
এরপর জন্ম হল একে একে আরো এগারো জন রাজপুত্রের। সবাই সমান সুন্দর আর সুলক্ষণ। কেউ কারো চাইতে কম নয় রূপে আর গুণে। তারা সবাই রয়ে গেল বাবার কাছে ত্রিপুরায়।

রাজ্যে সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনলেন রাজা ত্রিলোচন। প্রজারা সুখী হল। শিবের আদেশে তিনি সুদূর সমুদ্র দ্বীপ থেকে আনলেন দেবতার পূজকদের। তাদের বলে 'চন্তাই' আর 'দেওড়াই'। শিব আদেশ করেছেন, চোদ্দ দেবতার পুজো করতে হবে ত্রিলোচনকে। পুরোহিত হবে সাগর দ্বীপের 'চন্তাই' আর 'দেওড়াই'রা।

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি। রাজধানী ত্রিবেগে মহা সমারোহে অর্চনা করা হল চোদ্দজন দেবতার। তাঁরা হলেন শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব আর হিমালয়। রাজা ত্রিলোচনের সময় থেকেই চলে আসছে এই পুজো। চতুর্দশ দেবতার পুজোরই আর এক নাম খার্চি পুজো। আজো প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে ত্রিপুরার রাজধানীতে এ পুজো হয়। বলিদান করা হয় বহু ছাগ।

রাজা ত্রিলোচন দেবতাদের বরে শক্তি লাভ করলেন। এবারে ভাবলেন তিনি রাজ্যজয়ের কথা। সভা ডাকলেন। মন্ত্রী আর পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে করলেন আলোচনা। সৈন্য সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে।

'কাইফেঙ্গ' থেকে 'রাঙ্গামাটি' সব দেশের রাজারাই হার মানলো,



শ্রীশ্রী চতুর্দশ দেবতা

হর (শংকর)　উমা (শংকরী)　হরি (বিষ্ণু)　মা (লক্ষ্মী)　বাণী (বাগ্দেবী)　কুমার (কার্ত্তিকেয়)　গণপা (গণেশ)　বিধি (ব্রহ্মা)　ক্ষ্মা (পৃথিবী)

অব্ধি (সমুদ্র)　গঙ্গা (ভাগীরথী)　শিখি (অগ্নি)　কাম (প্রদ্যুম্ন)　হিমাদ্রি (হিমালয় পর্বত)

হল ত্রিলোচনের অনুগত। দিগ্বিজয়ের পথে ভীম আর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল ত্রিলোচনের। এর পর নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন তিনি।

বহুদিন ধরে রাজত্ব করলেন ত্রিলোচন। বয়স হল অনেক। বারো ছেলের ঘরে বহু নাতি-নাতনী হল তাঁর। অবশেষে পুত্র দাক্ষিণকে রাজা করে তিনি শিবলোকে চলে গেলেন।

ত্রিলোচনের বড়ো ছেলে তখন হেরম্বের রাজা। হেরম্বরাজ দেহরক্ষা করেছেন। এদিকে ত্রিলোচন পরলোকে যাবার পর তার এগারো ছেলে সব ধনরত্ন ভাগ করে নিলেন। দাক্ষিণের ভাগে কিছু বেশী ধন পড়লো। কারণ তিনিই দেশের রাজা তখন।

দাক্ষিণ তাঁর দশ ভাইকে করলেন দশজন সেনাপতি। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে রইল পাঁচ হাজার করে সৈন্য।

হেরম্বের রাজা এসব শুনে রেগে গেলেন। তিনি সবার বড়ো ভাই। পিতার ধনে তাঁরই প্রথম অধিকার। এ-কথা জানিয়ে ত্রিপুরায় দূত পাঠালেন তিনি। জবাবে একাদশ ভাই মিলে জানিয়ে দিলেন হেরম্বরাজকে, "তুমি সবার বড়ো হলেও বাবা তোমাকে ত্রিপুরা রাজ্য দিয়ে যান নি। তিনি ত্রিপুরার রাজা করে গিয়েছেন দাক্ষিণকে। তা ছাড়া বাবা বেঁচে থাকতেই তুমি চলে গিয়েছিলে হেরম্ব রাজ্যে। তুমি সেই রাজ্যের রাজা হয়েছ তারপর। সুতরাং পিতার ধনে তোমার কোনো আর দাবী নেই!"

এ কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন বড়ো ভাই। সুতরাং যুদ্ধ বাধলো ভাইদের মধ্যে। সাতদিন ধরে যুদ্ধ চললো ত্রিপুরা আর হেরম্বের সৈন্যদের মধ্যে। অবশেষে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে কপিলা নদী-তীর ছেড়ে রাজা দাক্ষিণ নতুন রাজধানী করলেন বরবক্র নদীতীরে 'খলংমা'তে। এই বরবক্র নদীর নামই এখন হয়েছে বরাক। হেরম্বরাজ কপিলা নদীতীরের রাজধানী দখল করে নিলেন। প্রজাদের নিয়ে বেশ ভালোই দিন কাটতে লাগলো তাঁর।

এদিকে রাজা দাক্ষিণের রাজধানীতে বাঁধলো নানা গোলমাল।

বরাক নদীতীরের খলংমা জায়গাটা ভালো নয়। সেখানেই সকল বীর জুটলো এসে। নদীর তীরের পাথরে ঘষে তারা তলোয়ার শান দিত। বালুচরে অস্ত্র রেখে তারা লড়তো মল্লযুদ্ধ।

এই সব কুকী বীরের এক এক জনের গায়ে পাগলা হাতীর শক্তি। যুদ্ধ তো থেমে গেছে। বীরদের গায়ের শক্তি তো ফুরিয়ে যায় নি। সে শক্তি তারা খাটাবে কোথায়? মদ আর মাংস খেয়ে খেয়ে সে শক্তি গেল আরো বেড়ে। তখন তারা নিজেদের মধ্যেই বাঁধিয়ে দিল হানাহানি। যদুবংশ যেমন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে ধ্বংস হয়েছিল, কুকী বীররাও তেমনি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরতে লাগলো। এ ভাবে প্রাণ হারালো পঞ্চাশ হাজার বীর। দাক্ষিণ তা দেখে খুব ভাবনায় পড়লেন। ভাবলেন, তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাবেন এ-জায়গা। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। এখানেই তাঁরও মরণ হল।

ধার্মিক রাজা শিক্ষরাজ

দাক্ষিণের বংশের আর এক রাজার নাম শিক্ষরাজ। ধর্ম-কর্মে খুব মতি ছিল তাঁর।

শিক্ষরাজ একদিন বনে গেলেন হরিণ শিকার করতে। গোটা বন ঘুরেও জুটলো না একটা হরিণ। সারা বন ঘুরে ঘুরে সারা হলেন তিনি। ফিরে এলেন শিবিরে। এসেই পাচক ঠাকুরকে আদেশ করলেন, "যে ভাবে পারো তাড়াতাড়ি আমাকে মাংস ভাত রান্না করে দাও, এই আমি স্নান করতে চললাম।"

পাচক পড়লো ভীষণ ভাবনায়। কোনো পশু নেই ধারে কাছে, আছে কেবল মানুষ। কি আর করবে বেচারা, একটা মানুষই ধরে নিয়ে গিয়ে চোদ্দ দেবতার কাছে উৎসর্গ করে বলিদান করল। নরমাংস রান্না করে পরিবেশন করলো রাজার পাতে। রাজা জানতে পারলেন না

কিছুই। নরমাংস খেতে খুব ভালো লাগলো রাজার। আহারাদির পর জানতে চাইলেন তিনি, "এমন সুস্বাদু মাংস কোথায় পাওয়া গেল, কিসের মাংসই বা এমন স্বাদু। জীবনে তো এমন মাংস খাইনি কোনোদিন।"

ভয় পেয়ে সব কথা বলে ফেললো পাচকঠাকুর। রাজা বললেন, "আমাকে ভয় পেয়ে তুমি এতো বড়ো একটা পাপ কাজ করলে ?"

রাজার মনে ভীষণ দুঃখ হল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মাংস খেয়ে ক্ষুধা বারণ করলেন তিনি ? এ-সব জানলে প্রজারা কি ভাববে ? প্রার্থনা করলেন রাজা, "হে হরি, তুমি আমায় রক্ষা করো।"

রাজ্যে আর মন রইল না শিক্ষরাজের। সন্ন্যাসী হলেন তিনি। তপস্যা করতে বনে যাওয়াই ঠিক করলেন। পুত্র দেবরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে চললেন রাজা। প্রজারা সব বনের পথে অনেকটা এগিয়ে এসে চোখের জলে রাজাকে বিদায় জানালো। নতুন রাজা দেবরাজও এলেন প্রজাদের সঙ্গে রাজাকে বিদায় জানাতে।

শিক্ষরাজ কোনোদিন আর ফিরে এলেন না। দেবরাজ অনেকদিন ধরে রাজকার্য চালালেন। তারপর দেবরাজের বংশের আরো অনেক রাজা পর পর সিংহাসনে বসলেন।

● শিবভক্ত কুমার

এভাবে মহারাজ বিমারের পুত্র কুমার বসলেন সিংহাসনে। তিনি ছিলেন শিবভক্ত।

রাজা ত্রিলোচন "সুবড়াই খুঙ্গ" নামে ছাম্বুল নগরে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ছিলেন শিব। মনু নদীর তীরে ছিল এই ছাম্বুল নগরী। মহামুনি মনু করেছিলেন এখানে কঠোর তপস্যা। মহারাজ কুমার গেলেন এখানে শিবের আরাধনা করতে। মনু মুনি তপস্যা করেছিলেন সেই সত্য যুগে। সেই থেকে এ নদীর নাম হয়েছে মনু নদী। পবিত্র এর জলের ধারা।

এই মঠে শিব বড়ো জাগ্রত দেবতা। কুকীরা এ অঞ্চলেই বাস করতেন। একবার এক কুকী রমণী পাথরের শিব ঠাকুরকে সাধারণ এক পাথর ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। শিব তখন দেখালেন তাঁর মহিমা। যত মানুষ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল কেউ আর কাউকে চিনতে পারে না। শিব সবার মন ভুলিয়ে দিলেন। কেউ হয়তো সেখানে এক মোচা ভাত নিয়ে গেল কাগজের পোঁটলায়। তার হাতেই হয়ে গেল সমান আকারের দু'টি ভাতের মোচা। বিশ্বপতি-শিব লুকিয়ে থেকে হাসেন। কেউ বুঝতে পারে না তাঁর কাণ্ডকারখানা।

পরে মানুষ বুঝেছে শিবের মহিমা। সেখানে গড়ে উঠেছে মন্দির। সেই থেকে শিব রয়েছেন সেই মন্দিরে। ভালো করছেন তাঁর ভক্তদের আর সাজা দিচ্ছেন দুষ্টদের।

● মৈছিলি রাজা

ত্রিপুরার সিংহাসনে তখন আছেন মহারাজ রাজেশ্বর। দুই ছেলে তাঁর। দুজনেই বড়ো বীর। মহারাজের মৃত্যুর পর রাজা হলেন বড়ো ভাই। কিন্তু মন তাঁর বড়োই অশান্ত। কারণ তাঁর কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। বহু বছর ধরে তিনি তাই ঈশ্বরের আরাধনা করলেন। পুত্র পাবার প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু তবুও তাঁর ছেলে হল না।

আষাঢ় মাস এলো আবার, এলো খার্চি পুজোর তিথি—শুক্লা অষ্টমী। চন্তাইকে নিয়ে রাজা চোদ্দ দেবতার মন্দিরে গেলেন। দেখতে পেলেন, নিজ নিজ আসনে সমাসীন রয়েছেন সব দেবতা। মূর্তি নয়, একেবারে ঠিক ঠিক জীবন্ত সব দেবতা। রাজা ভক্তিভরে পুজো দিলেন। বর চাইলেন, তাঁর যেন একটি ছেলে হয়। কিন্তু শিব বললেন, "তোমার ছেলে হবে না।"

শিবের কথা শুনে রাজা ভয়ানক রেগে গেলেন। তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে

তিনি আঘাত করলেন শিবকে। সে তীর গিয়ে বিঁধলো শিবের পায়ে। জবা ফুলের মতো লাল চোখে চেয়ে অভিশাপ দিলেন শিব, "শিবকে আঘাত করেছ তুমি, তোমার চোখ দুটি যাক নষ্ট হয়ে, অন্ধ হও তুমি।"

রাজা সত্যি অন্ধ হয়ে গেলেন। শিবের শাপ কখনো বিফল হয় না। এখন উপায়? 'চন্তাই' ছিলেন রাজার পাশেই। তিনি হাত জোড় করে শিবকে বললেন, "অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু, উপায় বলে দাও রাজার চোখ দু'টি ফিরে পাবার।"

চন্তাইয়ের কাতর প্রার্থনায় কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন শিব, "কলি যুগে সব মানুষ পাপ কাজ করবে। আমি তাই তাদের দর্শন দেব না কখনো। তবে যারা মন লাগিয়ে পুজো দেবে আমার তারাই শুধু দেখতে পাবে আমার পদচিহ্ন।" শিব আরো বললেন, "রাজা আমায় অপমান করেছে, তার কখনো আর ছেলে হবে না। তবে চক্ষু ফিরে পাবে সে। মানুষের বুক চিরে রক্ত নিতে হবে। সেই রক্তে পুজো হবে আমার সব ভূতপ্রেত চেলাচামুণ্ডার। আর রাজাকে খুব পবিত্র থাকতে হবে সে সময়। তবেই রাজা ফিরে পাবে আবার তার চক্ষু।" এই বলে শিব হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

রাজার আদেশে 'মৈছিলি'রা চলে গেল নানা জায়গায় মানুষের বুক চিরে রক্ত আনতে। তখনকার দিনে হত দেবতাদের সামনে নরবলি, ঠিক এখন যেমন হয় ছাগবলি। বলির মানুষ রাজ্য ঘুরে যারা খুঁজে আনতো তাদেরই বলা হত 'মৈছিলি'।

দেশের সব মানুষ জেনে গেল মৈছিলিদের মানুষ খোঁজার কথা। সবাই জীবনকে ভালোবাসে, বেঁচে থাকতে চায়। সব মানুষের মনে তাই ভীষণ ভয় ঢুকে গেল। বনে যায় না কেউ কাঠ কাটতে, বিশ্বাস করে না কেউ কাউকে।

তবুও মৈছিলিরা কৌশলে সংগ্রহ করলো নররক্ত। দেওয়া হল 'ভূতবলি'। রাজা আবার ফিরে পেলেন তাঁর চোখ দুটি। সেই থেকে এই রাজার নাম হল 'মৈছিলিরাজ'।

● হেরম্বরাজের রাজনীতি

রাজা গঙ্গারায়ের নাতির নাম প্রতীত। হেরম্বের রাজার সঙ্গে তার যোগাযোগ হল। হেরম্বরাজ দূত পাঠালেন প্রতীতের কাছে। জানালেন তাঁকে, "আমরা দুটি রাজ্যের রাজা হলেও বংশ আমাদের একই। আমরা দু'জনে ভাই ভাই।"

ভালো রাজনীতি জানতেন তিনি। তাই আরো জানালেন রাজা প্রতীতকে, "আমরা দু'ভাই কিছুদিন একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবো। লোকে দেখবে আর বুঝবে এঁরা দু'জনে বন্ধু রাজা। শত্রুরা তখন ভয় পাবে আমাদের। আমরা সুখে জীবন কাটাতে পারবো।"

তাই হ'ল। ছোটো ভাই প্রতীত গেলেন বড়ো ভাই হেরম্বরাজের বাড়িতে। দু'জনে আলোচনা করে দু'দেশের সীমানা ঠিক করলেন পাকা করে। হেরম্বরাজের কাছে কিছুদিন রইলেন রাজা প্রতীত। এক আসনে বসে খান দু'জনে, একসঙ্গে বেড়ান। খুব শান্তিতে কাটালেন ক'দিন দু'ভাই।

দু'ভাইয়ের এই মিলন সংবাদ রটনা হয়ে গেল। কামাখ্যা আর জয়ন্তিয়ার রাজারাও শুনতে পেলেন এ-সংবাদ। ভাবলেন তাঁরা, দু'ভাই মিলে ওঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে বিপদ হবে আমাদের। ওঁদের মধ্যে কৌশলে ঝগড়া লাগাতে হবে। বসে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়।

তাঁরা ভেবে-চিন্তে এক সুন্দরী মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন দু'ভাইয়ের কাছে। ওখানে গিয়ে কি করতে হবে তাকে তাও শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন মেয়েটিকে আগে থেকেই। মেয়েটি সেখানে গিয়ে এমনি ভাব দেখাতে লাগলো যে ত্রিপুরার রাজাকেই তার পছন্দ। তাঁরই গলায়

পরাবে সে মালা। তার সঙ্গে এসেছে এক দূত।

হেরম্বরাজ দূতকে বললেন, "আমাকে বরণ করবে বলেই তো তুমি এনেছ এই সুন্দরীকে, আমারই গলায় তো পরাবে সে মালা?" এ কথা শুনে সেই সুন্দরী সঙ্গে সঙ্গেই বললো, "না মহারাজ, ত্রিপুররাজ প্রতীতই হবে আমার বর, তাঁকেই আমার ভালো লেগেছে।"

সুন্দরীর কথা শুনে হেরম্বরাজ আদেশ দিলেন, "কে আছ, এর নাক-কান কেটে দাও সূর্পনখার মতো।"

রাজার আদেশে তখনই একজন ছুটে এলো সুন্দরীকে ধরতে, নাক কান কাটবে বলে। আর তখন সেই সুন্দরী ত্রিপুরার রাজাকে ডাকতে লাগলো প্রাণপণে, "রক্ষা করো, রক্ষা করো বলে।"

প্রতীত এগিয়ে এলেন। সেই রমণীর হাত ধরে চললেন ত্রিপুরায়, সঙ্গে চললো পাইক আর সেপাই সান্ত্রীরা। এভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লেগে গেল।

হেরম্বরাজ তো রেগে আগুন। সৈন্যদের আদেশ দিলেন যুদ্ধের সাজে সাজতে। বললেন তিনি, "ঐ সুন্দরীকে মেরে প্রতীতকে শিক্ষা দেব।"

সুন্দরীর কানে গেল সে কথা। সে জানালো রাজা প্রতীতকে, "চলো আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাই। আমাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করো তুমি, নইলে তোমায় ছেড়ে আমি আবার দেশেই ফিরে যাই।"

ত্রিপুররাজ সুন্দরীর মায়ায় জড়িয়েছেন। তার কথাই শুনলেন তিনি। তিনি তাকে নিয়ে চলে এলেন খলংমার কূলে।

হেরম্বরাজ মহা বিক্রমে এসে পৌঁছলেন ত্রিপুরায়। কিন্তু দেখলেন রাজধানী শূন্য, কেউ নেই সেখানে, না প্রতীত না সেই ছলনাময়ী সুন্দরী।

এবারে রাজার শুভ বুদ্ধির উদয় হল। বুঝলেন তিনি, একটি নারীর ছলনায় আমি হারাতে বসেছি আমার ভাইকে। না, সে হতে পারে না। ভাইকে ফিরে পেতে হবে আমার।

দশজন বুড়ো সেনাপতিকে ডাকালেন তিনি। সব কথা তাদের

খুলে বললেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে। প্রতীতও ফিরে এলেন নিজের রাজধানীতে আবার। দু'ভাইয়ের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলে তাদের শক্তি কমাবার কৌশল টিঁকলো না আর। শত্রু রাজাদের সকল জারিজুরি বিফল হল।

● রাঙামাটি জয়ের কাহিনী

দেশের নাম রাঙামাটি। রাজার নাম লিকা। তাঁর সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজার। বীর তিনি। ধামাই জাতি ছিল তাঁর পুরোহিত। পোশাক পরতেন ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে। ভালো খাবার খেতেন সব সময়, শুকনো বাসী খাবার খেতেন না কোনোদিন। প্রতি বছর করতেন গোমতী নদীর পুজো। মন্ত্রের শক্তিতে পুজোর সময় নদীর জল আটকে রাখতেন পুরোহিতরা। পুজো শেষে বাঁধন-খোলা মন্ত্র পড়ে আবার নদীর জল ছেড়ে দিতেন। গোমতীর জলধারা আবার বয়ে চলতো কুলু কুলু করে। রাঙামাটিতে বাস করতো লিকা জাতি। ধর্মে-কর্মে ছিল তারা নিপুণ।

ত্রিপুরারাজের চরেরা ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলো এই রাঙামাটির দেশ, লিকা জাতির মানুষদের। ভাবলো তারা, যুদ্ধ করে জয় করতে হবে এ-দেশ। ত্রিপুরার রাজা সেনাদের সাজতে বললেন।

নানা রকমের সেনা চললো রাঙা মাটির দিকে যুদ্ধের সাজে সেজে। পায়ে হেঁটে চললো পদাতিক সেনারা, চলেছে হাতী, ঘোড়া, চলেছে 'লাঙ্গাই' আর 'লাওড়াই' সেনা। মাঝে রয়েছেন ত্রিপুরার রাজা, ডাইনে বাঁয়ে সেনাপতিগণ। নানা রঙের পতাকা উড়ছে হাজার হাজার, সেনাদের হাতে হাতে নানা রকমের অস্ত্র। সবার আগে চলেছে শক্তিশালী কুকী সেনারা। ভালো দিন আর সময় দেখে যুদ্ধযাত্রা করেছেন ত্রিপুররাজ।

রাঙামাটির সীমানাতেই লিকা ছড়া। ছোট্ট পাহাড়ী নদী দৌড়ে

ছুটে চলেছে। ঝর্নার চাইতে অল্প বড়ো নদীকে বলে ছড়া। ত্রিপুর সেনা আসছে দেখে লিকা ছড়ার ধারে যারা ছিল তারা পালিয়ে গেল রাঙামাটির জঙ্গলের গভীরে।

লিকা রাজা বিপদ গণলেন। এবারে বুঝি আর তাঁর রাজ্য রক্ষা হয় না। মহা ভাবনা তাঁর। কোন্ কৌশলে রাখবেন রাজ্যপাট ?

রাজা লেখা-পড়া জানতেন কিছুটা। তিনি এ-কথাও জানতেন যে ত্রিপুরার রাজাও বই পুঁথি পড়েছেন, ধর্ম কর্ম জানেন।

পদ্মপুরাণ বইতে লেখা আছে, যেখানে তুষ থাকে সেখানে অলক্ষ্মী বিরাজ করেন। তাই ধার্মিক লোক কখনো তুষের ওপর পা রাখেন না।

একথা ভেবে লিকা রাজা মণ মণ তুষ বিছিয়ে গড় তৈরী করলেন। তাঁর বিশ্বাস ধার্মিক ত্রিপুরারাজ তুষে পা রেখে এ গড়ে যুদ্ধ করতে আসবেন না, বিনা যুদ্ধে তিনি ফিরে যাবেন।

লিকা রাজা নিশ্চিন্তে তুষের গড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজনীতি বুঝি ধর্মের ধার ধারে না। ত্রিপুরার রাজা এ-সব কিছুই মানলেন না। তিনি সৈন্য ও সেনাপতি নিয়ে তুষের গড়ে ঢুকলেন। তুমুল যুদ্ধ হল দুপক্ষের সেনার মধ্যে। সৈন্যদের পদভরে যেন সারা দেশের মাটি কেঁপে উঠলো। সেনা ছাউনি ত্রিপুরার সেনাদের হাতে চলে গেল। লিকা রাজা পরাজিত হলেন। ত্রিপুরার রাজাকে ডেকে বললেন তিনি, "তুমি ধর্ম মানলে না রাজা, তুষে পা ফেললে। বেশী দিন বাঁচবে না তুমি, তোমার ধন-সম্পদও রইবে না অধিক কাল।"

রাঙামাটি ত্রিপুরার দখলে এলো। সেখানে নতুন করে রাজ্য গড়লেন ত্রিপুরার রাজা। আর গড়ে তুললেন লিকা সেনাদের একটি শক্তিশালী দল।

এরপর রাজার বাসনা জয় করবেন বঙ্গদেশ। প্রথমেই পাহাড়ী গ্রাম 'বিশালগড়' দখল করলেন তিনি। আর তখন থেকেই বিশালগড় হল ত্রিপুরা রাজ্যের এক অংশ।

রাঙামাটিতেই রয়ে গেলেন ত্রিপুরারাজ। অনেক বয়স হল তাঁর।

তাই দেহটা আর টিঁকলো না। তিনি দেহ রাখলেন রাঙামাটিতেই। সেখানেই হল তার সমাধি। শ্মশানের ওপর তৈরী হল মঠ। রাজ-শ্মশান দেখে রাখবার জন্য প্রহরীদের ঘর তৈরী হল মঠের পাশেই। রাজার শ্মশানক্ষেত্রের নাম রাখা হল 'বৈকুণ্ঠপুরী'। আবার কেউ কেউ এ সমাধিকে বলতো "মুক্তিশালা"।

● মহারানী মহাদেবী ও রাজা ছেংথুম্ ফা

ত্রিপুরার আর এক রাজা ছিলেন 'ছেংকাচাগ'। তাঁর ছেলের নাম ছিল 'ছেংথুম্ ফা'। পরে রাজা হলেন তিনি। তারপর একদিন রাজা ছেংথুম্ ফার ধন রত্ন সব লুটে নিল হীরাবন্ত খাঁ। ধনরত্ন নিয়ে সে পালিয়ে গেল গৌড়ে। আর গৌড়ের রাজা এই দুষ্ট লোকটাকে দিলেন আশ্রয়।

ছেংথুম্ ফা এই অন্যায় মেনে নিতে পারলেন না। হীরাবন্তকে কি করে সায়েস্তা করা যায় তাই ভাবছেন তিনি।

এদিকে হীরাবন্ত খাঁ গৌড়ের রাজাকে এমন ভাবে সব জানালেন যেন সব অপরাধ রাজা ছেংথুম্ ফার। সব শুনে গৌড়ের রাজা দু'তিন লক্ষ সেনা পাঠালেন রাঙামাটি জয় করার জন্য।

রাজা ছেংথুম্ ফা ভয় পেলেন। এত সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন এবং সন্ধি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে রকম আদেশই দিলেন তিনি সেনাপতিদের।

রাজরানী মহাদেবী শুনতে পেলেন একথা। এ রকম বিনা যুদ্ধে সন্ধি করা হেরে যাবার সামিল। তিনি রাজ্যের এই অপমান সইবেন কেমন করে? রাজাকে তিনি এজন্য অনেক গালাগাল করলেন। বললেন তিনি, "তুমি কাপুরুষ, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে দেশের মান ডোবাতে চাও। আমি তা হতে দেবো না, নিজেই লড়বো দেশের জন্য।"

মহারানী মহাদেবী সকলকে ডাকলেন। বললেন, "যুদ্ধের সাজে সাজো সবাই"। রানীর কথায় ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো, সেনা সেনাপতি সব হাজির হল এসে।

মহারানী বললেন, "তোমরা সবাই আমার ছেলের মতো। দেশের বড়ো বিপদ। যমের মতো সব গৌড়ের সেনা রাজ্যের সীমায় এসে পৌঁছেছে। দেশের রাজা ভয় পেয়ে করতে চাইছেন সন্ধি। তা হতে পারে না। দেশের বীর ছেলেরা দেশের মান রাখো। আমি যাবো যুদ্ধে। তোমরা চলো আমার সঙ্গে। শত্রুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।"

মায়ের ডাকে সাড়া দিল সব ত্রিপুর সেনা। শপথ নিলো তারা, প্রাণ দিয়েও মান রাখবে দেশের।

বীরাঙ্গনা রমণীরা এলো মহারানীর কাছে। তারা ভার পেলো সেনা পরিচালনার। নত মাথায় সঙ্গে চললেন রাজা আর তাঁর জামাতার দল।

মহারানী নিজে নারী সেনাদের নিয়ে রান্না করতে বসলেন। বিরাট ভোজের আয়োজন। মোষ কাটা হল অনেক, কাটা হল বহু ছাগ আর গয়াল। মেষ, শূকর আর হাঁস যে কতো মারা হল তার কোনো সংখ্যা নেই। এর সঙ্গে রইল হরিণের মাংস আর বুনো পাখির মাংস।

হাজার হাজার কলস মদ তৈরী হল। আয়োজন হল দই দুধের। বিকেল থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল আহার। রান্না হয়েছে যেন অমৃত। সৈন্যরা কোনোদিন এমন ভালো খাবার খায়নি। সবাই খুব খুশী। সারারাত কাটলো তাদের বিশ্রামে আর আমোদ প্রমোদে।

প্রভাতবেলায় হাজার হাজার ত্রিপুর সেনা এগিয়ে চললো সামনে। যারা আগে গেল তারা গৌড়ের সেনাদের পথ আগলে দাঁড়ালো। তারা আর এক পাও এগুতে পারলো না ত্রিপুরার দিকে। ত্রিপুরী সেনার সিংহনাদে আর যুদ্ধের বাদ্যে আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগলো।

দু'দল সেনা মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। রানী হুংকার দিয়ে জানালেন, 'যুদ্ধ করো ত্রিপুর সেনারা'।

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ত্রিপুরী সেনার যুদ্ধবিক্রমে গৌড় সেনাদল ভয় পেলো। যুদ্ধে কাতর হয়ে এদিক সেদিক পালাতে লাগলো তারা। পালিয়ে-চলা সেনাদের পেছনে ছুটে, তলোয়ারের আঘাতে, কেটে ছ' টুকরো করতে লাগলো ত্রিপুরী সেনারা। তিন দিকে ছুটে পালালো গৌড় সেনারা, তিন দিকেই তাদের পিছু নিল ত্রিপুরী সেনা। মুখে তাদের মার মার কাট কাট শব্দ।

মহারানী মহাদেবীর বীরপণায় খুশী হয়ে যুদ্ধ দেখতে এসেছেন চোদ্দ দেবতারা সবাই। মাথায় তাঁদের সোনার মুকুট, সোনার তৈরী খাঁড়া তাঁদের হাতে, পোষাকে সোনার জরি। তারাও চলেছেন ত্রিপুরী সেনার আগে আগে। আর ত্রিপুরী সেনারা ভাবছে এই বুঝি আমাদের সেনাপতি।

দেবতা আর মানুষ মিলে সে এক ভয়ংকর যুদ্ধ হল। ঘোড়া কাটা পড়লো হাজার হাজার, কাটা পড়লো হাজার হাজার হাতী। সেনা যে কতো কাটা পড়লো তার কোনো হিসেবই নেই।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। ছেংথুম্ ফা তাকালেন একবার আকাশের দিকে। আকাশও যেন আজ কাঁদছে গৌড় সেনাদের দশা দেখে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজা। বলে উঠলেন, "একি, একি?" আকাশে নাচছে তখন এক গলাকাটা কবন্ধ, তার বিশাল শরীর নিয়ে। ভয় পেয়ে রাজা একই সঙ্গে রাম কৃষ্ণ আর নারায়ণ এই তিন দেবতার নাম জপ করলেন। বাকী গৌড় সেনারা ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

রাজা বললেন, রামায়ণে লেখা আছে এক লক্ষ সেনা মারা গেলে আকাশে কবন্ধ নাচে। এ যুদ্ধে এক লক্ষ গৌড় সেনা প্রাণ দিয়েছে।

বড়োই ক্লান্ত হয়েছেন রাজা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না আর কিছুতেই। একটু বসবার জায়গা তাঁর বড়ো প্রয়োজন। কিন্তু রণক্ষেত্রে কোথাও তেমন একটু ঠাঁই নেই।

ত্রিপুরা রাজের মেয়ের জামাই ছুটে এলেন। বড়ো বড়ো দাঁতাল হাতী পড়ে আছে হাজারে হাজারে। জামাতা হাতীর দাঁত কেটে

এনে বসবার আসন গড়ে দিলেন শ্বশুরমশায়ের। তিনিও খুব খুশী। জামাইকে ডেকে বসালেন পাশে, আদর জানালেন ছেলের সমান।

সেই থেকে ত্রিপুরায় রাজ-জামাতাদের খুব খাতির। তাঁদের জন্য পাকশালের দোর খোলা। এর পর থেকে জামাতারাই হয়ে আসছেন সেনাপতি।

এভাবে মেহের কুল হাতে এলো ত্রিপুরার। রাজারাও প্রজাদের সুখ-সুবিধে বাড়াতে পারলেন অনেকখানি।

রত্ন ফার পরীক্ষা

মহারাজ খিচোঙ্গ ফার ছেলে ডাঙ্গর ফা। তাঁর রানীর নাম ডাঙ্গর মা। মহারাজা ডাঙ্গর ফার আঠারো ছেলে। মহারাজ বুড়ো হয়েছেন। ভাবছেন তিনি, কোন্ ছেলেকে করবো রাজা, কার হাতে তুলে দেবো রাজ্যপাট। পরীক্ষা করতে চাইলেন তিনি কোন্ ছেলে তাঁর বেশী চালাক চতুর।

মহারাজ ছেলেদের ডেকে বললেন, "একাদশীর উপবাস করবো আমি, তোমরাও উপোস কর আমার সঙ্গে, পুণ্য হবে তোমাদের"। জলটুকুও না খেয়ে মহারাজ উপোস রইলেন আঠারো দিন। ছেলেরাও রইল উপোস।

উপোস ভাঙবার তিন দিন আগে মহারাজ গোপনে ডেকে বললেন রাজার কুকুর রক্ষককে, "তিরিশটা কুকুরকে উপোস রাখো তিন দিন। আমরা যখন সবাই উপোস ভেঙ্গে পারণা করবো তখন কুকুরগুলো নিয়ে কাছাকাছি থেকো আর আমি যেমন বলবো তাই করবে। দেখো, কথা মতো কাজ না করলে ঘাতকের হাতে মাথা কাটাবো তোমার।

পারণার দিন এগিয়ে এলো। রাজকুমারদের খিদেও বাড়তে লাগলো প্রতিদিন। রাজার ছেলেরা কোনোদিন অনাহারে থাকেনি। উপোস

করার কোনো কষ্ট তারা জানতেন না। সারাদিন কাটে কথায় কথায়। রাত আসে রাক্ষুসীর মতো। পেটে খিদে, চোখে ঘুম নেই। খিদের জ্বালায় রাজকুমারদের মনে হয়, সামনে যা পাই তাই খেয়ে নিই। কিন্তু পিতার আদেশ, ব্রত ভাঙবার উপায় নেই।

শেষের রাতটাও ছটফটিয়ে কাটলো সবার। পরদিনই পারণা। ভোরের আলো আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলো। এবারে পারণার আয়োজন হবে নিশ্চয়।

মহারাজ ডাঙ্গর ফা পুজো আর তপে জপে কাটালেন সকালবেলাটা। রাজকুমারদের পেটের খিদে বাড়লো আরো।

দুপুরে মহা সমারোহে মহাভোজের আয়োজন। নানা রকম ভালো ভালো জিনিস পাতে পড়েছে রাজকুমারদের। রাজাও বসেছেন তাঁদের সঙ্গে। পাতের খাবারগুলো যেন মায়ের ভালোবাসার মতো তাকিয়ে রয়েছে সবার দিকে।

খাবার সবে মুখে তুলতে গেছেন সবাই, অমনি রাজার আদেশে তিরিশটা কুকুর এনে একই সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হল সেখানে। কুকুরদের পেটেও তিন দিনের খিদের আগুন। এক সঙ্গে তিরিশটা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো সবার পাতে। রাজা আর তার সতের ছেলে খাবার ফেলে উঠে পড়লেন। উঠলেন না শুধু ছোটো রাজকুমার রত্ন ফা।

আঠারো পাতের খাবার খেতে ব্যস্ত হল সব কুকুর। একটি দুটি কুকুর ছুটে এলো রত্ন ফার দিকে। তিনি মুঠো মুঠো খাবার দূরে ছুঁড়ে দিয়ে তফাতে রাখলেন তাদের। কুকুরগুলো কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগলো। সেই সুযোগে ছোটো রাজকুমার খিদে তেষ্টা মেটালেন। রাজা আর অন্য রাজকুমার তাঁর বুদ্ধি দেখে হতবাক।

পরীক্ষা শেষ হল। পাস করলেন রত্ন ফা। মহারাজ ডাঙ্গর ফা বুঝলেন ছোটো কুমার রত্ন ফাই সবার মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই পারবেন ত্রিপুরার প্রজাদের পালন করতে।

● গৌড়ের রাজা ও কুমার রত্ন ফা

সতেরো জন ছেলেকে সতেরো জায়গার রাজা করে দিলেন ডাঙ্গর ফা। তবে ছোটো ছেলে রত্ন ফাকে কোনো জায়গার রাজা করা হল না।

বঙ্গের রাজার সঙ্গে ছিল ডাঙ্গর ফার মিতালী। ছোটো ছেলে রত্ন ফাকে তাই তিনি পাঠালেন বঙ্গে। সঙ্গে গেল নানা জাতির দু'শ চল্লিশ জন সেনা। রত্ন ফা বঙ্গদেশের সব তীর্থগুলো দেখবেন ঘুরে। গঙ্গাজলে স্নান করবেন, গঙ্গাজল পান করে পবিত্র হবেন। পবিত্র গঙ্গাধারার বঙ্গদেশে যাবেন রত্ন ফা।

ছোটো রাজকুমার সবার প্রিয়। তাঁকে যেমন ভালোবাসেন রাজা রানী তেমনি ভালোবাসে প্রজারা। রত্ন ফা চলে গেলে কান্নার রোল উঠলো সারা দেশে। ডাঙ্গর মা কাঁদছেন, কাঁদছে প্রজারা সবাই, কাঁদছে আকাশ বাতাস পশুপাখী।

সঙ্গের লোকদের নিয়ে বঙ্গে পৌঁছলেন গিয়ে রত্ন ফা। গৌড়ের রাজা নিজের ছেলের মতো আদর যত্ন করলেন রত্ন ফার। রাজসভা নানাভাবে জানালো তাঁকে সম্মান। তাঁর কাছে নানা জনে নানা খবর জানতে চাইল ত্রিপুরার। সব প্রশ্নের জবাব দিলেন রত্ন ফা। পাহাড়ী দেশের পাহাড়ী কথা জানতে সবার সমান ইচ্ছে।

এক ঘটনা ঘটে গেল এরই মধ্যে। বাংলাদেশে এলো হেমন্তকাল। ধান-কাটা মাঠে মাঠে বাসা বাঁধলো ঘুরঘুরে পোকার দল। ত্রিপুরার কুকীদের বড়ো প্রিয় এই 'ঘুগরো' পোকা। রত্ন ফার সেনারা নিজেদের আর সামলাতে পারলো না। মাঠে নেমে পড়লো তারা। মাঠ ঘুরে গর্ত খুঁড়ে পোকা ধরে মুখে পুরতে লাগলো তারা।

বাংলাদেশের সব মানুষ এদের কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। ঘুরঘুরে-পোকা-খাওয়া-মানুষ তারা কখনো দেখেনি আগে। বঙ্গের

রাজার কানেও গেল এ সংবাদ শেষে। হেসে রত্ন ফাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ, "পোকা ধরে খায় তোমার দেশের মানুষ ?"

রাজকুমার সে কথা শুনে বললেন, "আমাদের ত্রিপুরাতে রয়েছে নানা জাতের মানুষ। তাদের পোশাক-আশাক নানা রকম, নানা রকমের আহার তাদের। বঙ্গদেশে কি নেই এমন নানা রকমের মানুষ ?"

বঙ্গের মহারাজ এ-কথা শুনে ভাবলেন মনে, তবে তো ত্রিপুরা সত্যই ভালো দেশ, নানা রকম মানুষ সেখানে। তবে তো খুব মহান সেখানকার মহারাজা, কতো রকমের মানুষকে রেখেছেন শাসনে। আর তারা বাড়িয়েছে তাঁর শক্তি।

রাজকুমারের আদর আরো বেড়ে গেল। আরো কিছুদিন কাটলো সুখে, গৌড়েশ্বরের অতিথি হয়ে।

একদিন দরবারে ডেকে পাঠালেন রত্ন ফাকে বঙ্গদেশের রাজা। দেখে অবাক হলেন তিনি, রাজকুমারের মুখখানা শুকনো, তার শরীরও গেছে শুকিয়ে। কারণ জানতে চাইলেন মহারাজ।

ছোট রাজকুমার রত্ন ফা বিনয় করে বললেন, "এখানে আমার কোনো অভাব নেই, নেই কোনো কষ্ট। বেশ আছি আমি ভালো খাবার খেয়ে, নাচে গানে আমোদে প্রমোদে। তবে দুঃখ আমার মনের মাঝে অন্য কারণে। মহারাজ অভয় দিলে বলতে পারি সে কথা।"

মহারাজ বললেন, "বলো তোমার কি দুঃখ। সাধ্য হলে আমি তোমার বেদনাকে আনন্দের মালা পরিয়ে সাজাব।"

অভয় পেয়ে বললেন রাজকুমার, "বাবা ত্রিপুরার এক এক অঞ্চলের রাজা করে দিয়েছেন আমার এক এক ভাইকে। আমাকে কিছু দেননি, দিয়েছেন পাঠিয়ে এই বাংলাদেশে। এ দুঃখই আমার বড়ো দুঃখ।"

গৌড়েশ্বর বললেন, "কি করতে চাও তুমি এখন, কি তোমার মনের ইচ্ছে ?"

রত্ন ফা বললেন, "মহারাজ, আপনার দয়া হলেই আমার সকল কাজ সফল হবে।"

সব বুঝতে পারলেন সুলতান সামসুদ্দিন। ইনিই তখন বাংলাদেশের সুলতান। তিনি রত্ন ফাকে দিলেন বাংলার বীর সেনার দল। বললেন তিনি, "এই বীর সেনাদের সহায়ে তুমি তোমার দেশে ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসো রাজা হয়ে।"

কুকী সেনা আর বঙ্গদেশের সেনা নিয়ে চললেন রত্ন ফা নিজের দেশে ফিরে। পথে পড়লো জামির খাঁর গড়। রত্ন ফা জয় করে নিলেন সে গড়। তারপর অধিকার করলেন রাঙ্গামাটি। রাজা ডাঙ্গর ফা তখন ছিলেন রাঙ্গামাটিতেই। তাঁর সব সেনা ভয়ে লুকালো গিয়ে বনে পর্বতে। গৌড়ের সেনা রত্ন ফার আদেশে তাদের পিছু ছুটলো। পালিয়ে রইলেন ডাঙ্গর ফাও। থানাংচি পাহাড়ে মারা গেলেন তিনি।

এরপর বিপদ বুঝে বেরিয়ে এলেন সকল রাজকুমারেরা। বাঁধলো ভীষণ যুদ্ধ। রত্ন ফার সেনাদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠলো না। সবাইকেই হল পালাতে আর পিছু হটতে।

সব ভাইকে লড়াই করে হারিয়ে রত্ন ফা দখল করে নিলেন গোটা ত্রিপুরা রাজ্য। তারপর তিনি আবার ফিরলেন বঙ্গে। সুলতানের জন্য ভেট নিয়ে গেলেন বড়ো বড়ো হাতী আর অনেক ধনরত্ন। সুলতান সামসুদ্দিন খুব খুশী।

রত্ন ফা রাজা হলেন ত্রিপুরায়। সুখে কাল কাটছে তার। একদিন পশু শিকারে গেলেন রত্ন ফা। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরের গভীর বন। সে বনে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন রত্ন ফা। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো উজ্জ্বল এক বস্তুর দিকে। তার পাশে বসে মস্ত এক কোলা ব্যাঙ। জ্বল জ্বল করছে কি ওটা? এগিয়ে গেলেন রত্ন ফা। দেখলেন, ব্যাঙের পাশে পড়ে আছে এক মহামূল্য মাণিক।

ব্যাঙ মেরে মানিক কুড়িয়ে নিলেন মহারাজ রত্ন ফা। মাণিক কুড়িয়ে পেলেন বলে ঐ জায়গার নাম রাখলেন মাণিকভাণ্ডার। এখনো সে নামই রয়েছে জায়গাটার। বন কেটে বসতি হয়েছে এখন কৈলাসহরের মাণিকভাণ্ডারে।

সে মাণিক উপহার দিলেন রত্ন ফা বঙ্গ সুলতান সামসুদ্দিনকে। মাণিক পেয়ে মহা আনন্দ সুলতানের। রত্ন ফাকে দিলেন তিনি নতুন উপাধি। সেদিন থেকে রত্ন ফার নাম হল রত্নমাণিক্য। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজাদের উপাধি হল মাণিক্য।

● ধর্মমাণিক্য ও কৌতুক ঠাকুর

রত্নমাণিক্য বুড়ো হয়ে স্বর্গে গেলেন। তাঁর দুই ছেলে— প্রতাপমাণিক্য আর মুকুটমাণিক্য। প্রতাপমাণিক্যের প্রতাপ ছিল অধর্মের আর অত্যাচারের। তাই এক রাতের আঁধারে দশ জন সেনাপতি মিলে তাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। রাজা হলেন মুকুটমাণিক্য।

মুকুটমাণিক্যের পরে রাজা হলেন তাঁর ছেলে মহামাণিক্য। মহামাণিক্যের ছেলের নাম ধর্মমাণিক্য। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার খুব বড়ো রাজা।

দেশে দেশে রাজা হয়, আবার হয় রাজার পরাজয়। জগতে কিছুই বসে নেই, চলেছে সব। রাজা থাকে না কেউ চিরকাল, রাজ্য থাকে না একরকম। তবুও রাজায় রাজায় লড়াই বাঁধে, প্রজাদের হয় বিড়ম্বনা। মেরে কেটে ন্যায়ে অন্যায়ে সিংহাসন আঁকড়ে থাকতে চায় শাসকেরা। ভাবে না মরণ আছে, পতন আছে। কালের গতিক তাদের মন ভুলিয়ে মোহের ফেরে ঘুরিয়ে মারে। এ বড়ো আশ্চর্য কথা। এ-সব অবাক করা ঘটনাগুলোই শেষে হয় ইতিহাস।

মহামাণিক্য মহারাজের পাঁচ ছেলে। সবার বড়ো ধর্মমাণিক্য। সংসার আর রাজ্যপাট তাঁর ভালো লাগলো না। সন্ন্যাসী হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। নানা তীর্থে ঘুরে ফিরে শেষে এসে পৌছলেন বারাণসী ধামে।

একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে গাছের ছায়ায় রয়েছেন ঘুমিয়ে। ছায়া সরে গিয়ে কখন রোদ এসে পড়েছে তাঁর মাথায়। কোথা থেকে বড়ো এক সাপ ছুটে এলো সাঁ করে। ফণাটি তুলে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে রইল রাজার মাথার উপর। রাজা তখনো ঘুমিয়ে রয়েছেন।

'কৌতুক' নামে কনৌজ দেশের এক ব্রাহ্মণ দেখতে পেলেন এই অবাক কাণ্ড। খানিক বাদে জাগিয়ে দিলেন তিনি ধর্মমাণিক্যকে। বললেন, "কোন্ দেশের মানুষ গো তুমি? থাকো কোথায়?" ধর্মমাণিক্য বললেন, "আমি জাতিতে ত্রিপুরী, ত্রিপুরা আমার দেশ।"

কৌতুক ঠাকুর বললেন, "তুমি সন্ন্যাসী হয়ে মিছেই দুঃখ পাচ্ছ। তোমার কপালে তো রাজ্য ধন লেখা রয়েছে। দেশে ফিরে যাও, রাজা হবে তুমি।"

সাপে ফণা তুলে মাথায় ছায়া করলে সে লোক রাজা হয়, বামুন একথা জানতেন।

ধর্মমাণিক্য বললেন বামুন ঠাকুরকে, "রাজী আছি দেশে ফিরে যেতে। তবে তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

কনৌজী কৌতুক ঠাকুর রাজী হলেন ত্রিপুরায় আসতে।

এদিকে ধর্মমাণিক্যের চার ভাই রাজ সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাঁধিয়েছে। সবাই রাজা হতে চায়। সৈন্য সেনাপতি আর প্রজারা সব পড়েছে মহা বিপদে। চারদিকে লোক লস্কর ছুটেছে বড়ো রাজকুমারকে খুঁজতে। তাঁকেই করবে তার রাজা।

খুঁজতে খুঁজতে তারাও গিয়ে উপস্থিত বারাণসী ধামে। সেখানে তারা ধর্মমাণিক্যকে দেখে অবাক। রাজার ছেলে সেজেছে সন্ন্যাসী! নমস্কার করে রাজ্যের সব বৃত্তান্ত জানালো তারা ধর্মমাণিক্যকে। আর বললো, "চলো তুমি রাজ্যে ফিরে, আমরা তোমাকেই রাজা করবো, কিছুতেই আর তোমাকে ছেড়ে ফিরে যাবো না আমরা।"

আটজন বামুন নিয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন ধর্মমাণিক্য। সেনাপতিরা এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিলো, চার ভাই এগিয়ে এসে করলো

আলিঙ্গন। প্রজারা সবাই মিলে ধর্মমাণিক্যকে বসালো সিংহাসনে। রাজা হলেন ধর্মমাণিক্য।

বত্রিশ বছর রাজত্ব করলেন ধর্মমাণিক্য। প্রজাদের জন্য কাজ করে গেলেন অনেক। দুটো বড়ো দীঘি করালেন স্নান পানের সুবিধের জন্য। এখনো সে বিশাল দীঘি দুটো রয়েছে বর্তমান, ধর্মমাণিক্যের কীর্তি ঘোষণা করছে তারা। একটি দীঘি রয়েছে বাংলাদেশের কুমিল্লায় আর অন্যটি রয়েছে কসবায়। দু'টি দীঘিরই নাম ধর্মসাগর। বামুনদেরও তিনি দান করলেন অনেক ভূমি।

প্রজারা বড়ো সুখে ছিল ধর্মমাণিক্যের শাসনে। ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী 'রাজমালা' লেখা হল রাজা ধর্মমাণিক্যের সময়েই।

● ধন্যমাণিক্য আর রাজপুরোহিত

ধর্মমাণিক্যের ছেলে ধন্যমাণিক্য আর প্রতাপমাণিক্য। প্রতাপমাণিক্যই প্রথমে হয়েছিলেন রাজা। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল খুব খারাপ। প্রজাদের কষ্ট ভীষণ বেড়ে গেল তাঁর সময়ে। অধার্মিক এই রাজাকে শেষে সবাই মিলে মেরে ফেললো। রাতের অন্ধকারে তারা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজার দেহটার উপর। রাজা অধার্মিক হলে এমনিই হয় তার অবস্থা।

রাজ্যে রাজা নেই। সেনাপতিরা সবাই চায় রাজা হতে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। রাজ্য জুড়ে তখন নেমেছে ভয়ের অন্ধকার। রাজকুমার ধন্যমাণিক্যেরও বিপদ, কখন প্রাণ যায় কার হাতে। রাজপুরোহিত তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন ধন্যমাণিক্যকে।

সেনাপতিদের বিবাদ আর মেটে না। অবশেষে বড়ো সেনাপতি বললেন সবাইকে, "চলো আমরা বড়ো রাজকুমারকেই রাজা করি। নয়তো নিজেরা ঝগড়া করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবো। একজনে রাজা হলেই সুবিধে, সবাই রাজা হওয়া সাজে না।"

বুড়ো সেনাপতির কথা শুনলো সবাই। বড়ো রাজকুমার যে একজন আছেন সে-কথাই তারা ভুলে বসেছিল। এবারে মনে পড়লো সকলের। খোঁজ পড়লো, "রাজকুমার ধন্যমাণিক্য কোথায়? তাঁকেই আমরা শুভদিনে সিংহাসনে বসাতে চাই।" ধাত্রীকে ধরলো তারা রাজার সংবাদ জানাতে।

ধাই-মা বিপদ গণলেন। ভাবলেন, অরাজক প্রজারা বুঝি বা ধন্যকেও মেরে ফেলবে। বললেন তিনি বড়ো সেনাপতিকে, "জানি আমি কোথায় রয়েছে রাজকুমার, সন্ধান দিতে পারি তাঁর। কিন্তু তার আগে শপথ করতে হবে তোমাকে, বলতে হবে তুমি তাঁকে প্রাণে মারবে না।"

শালগ্রাম শিলা ছুঁয়ে শপথ করলেন বড়ো সেনাপতি, "তিন সত্যি করে এই ঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে বলছি, ধন্যকে রাজা করবো আমরা, তাঁর কোনো ক্ষতি করবো না।"

এবারে নিশ্চিন্ত হলেন ধাই-মা। বললেন, "যাও তোমরা রাজপুরোহিতের বাড়ি, সেখানে পাবে ধন্যকে।"

সব সেনাপতি মিলে হাতি ঘোড়ার পিঠে চেপে সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে চললো পুরোহিতের বাড়ি।

এদিকে ধন্য ভাবছেন, "ওরা সব আসছে বুঝি আমার প্রাণ নিতে।" এই ভেবে তিনি লুকিয়ে রইলেন পুরোহিতের ঘরের মাচার নিচে।

পুরোহিত অভয়বাণী শুনিয়ে ধন্যমাণিক্যকে এনে পৌঁছে দিলেন সেনাপতির কাছে। সবাই দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলো ধন্যকে। সবিনয়ে বললো সবাই, "ভয় করো না রাজকুমার, অধর্মে মতি ছিল বলে মেরেছি তোমার ভাইকে, এবারে তুমিই হবে রাজা। আশা করবো আমরা, পিতার মতো ধর্মে মতি রেখে তুমি পালন করবে প্রজাদের।"

মহা ধুমধামে অভিষেক হয়ে গেল। রাজা হলেন ধন্যমাণিক্য। প্রজাদের মনে আবার লাগলো শান্তির বাতাস।

বড়ো সেনাপতির মেয়ের নাম কমলা। তিনি ধন্যের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দিলেন। কমলা হলেন ত্রিপুরার মহারানী।

সেনাপতিদের কথামতো রাজ্য চালাচ্ছেন ধন্যমাণিক্য। সেনাপতিরাই যেন রাজ্যের রাজা। সকল সেনাকে তাঁরা তাঁদের অধীনে ভাগ করে নিয়েছেন। রাজার আদেশ পালন করবার কোনো সেনা নেই আর। রাজা যেন ঠুঁটো জগন্নাথ, রাজ্য হল 'সহস্ররাজক'।

তবে রাজার পক্ষে একজন মাত্র ব্যক্তি আছেন। তিনি রাজপুরোহিত। গোপনে বললেন তিনি একদিন রাজাকে, "কি হবে এমন রাজা থেকে যার কোনো কথা টেঁকে না, যার কোনো স্বাধীনতা নেই।"

পরামর্শ চললো রাজায় আর পুরোহিতে। ঠিক করা হল, কৌশলেই সব সমাধান করতে হবে। পুরোহিতের পরামর্শে রাজা রইলেন ভেতর বাড়িতে। সেখানে যেতে দেওয়া হয় না কাউকে। রাজা সেখানে ভালো ভালো খাবার খান আর কুস্তি-লড়া শেখেন। রাজ্য জোড়া প্রচার করা হল, রাজার খুব কঠিন অসুখ, তাই তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন অন্তঃপুরে।

রাজা থাকেন অন্ধকারে। রানীরও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সিংহ দরজায় পাহারা দিচ্ছেন বড়ো সেনাপতি।

এ-ভাবে কাটলো তিন মাস। বড়ো সেনাপতি জানতে চাইলেন মহারানী কমলার কাছে, কি অসুখ করেছে মহারাজের। মহারানী জবাব দিলেন, তিনিও ভালো করে দেখতে পান না অন্ধকারে মহারাজকে। তবে তাঁর শরীরটা হয়েছে আগের তুলনায় অনেক বড়ো।

বড়ো সেনাপতি ভাবলেন, তবে তো মহারাজের পাণ্ডুরোগ হয়েছে। তাই শরীরটা উঠেছে ফেঁপে। অনেক অনেকদিন তাঁকে ভুগতে হবে এ ব্যাধিতে। আসলে রোজ কুস্তি-লড়ে দেহখানা পুষ্ট করেছেন মহারাজ।

রোগে পঙ্গু মহারাজকে দেখতে চাইল সব সেনাপতিরা। পুরোহিতের সাহায্য চাইলেন তাঁরা। এবারে বড়ো সুযোগ এলো রাজা আর রাজ পুরোহিতের। পুরোহিত জানালেন সেনাপতিদের, আগামীকাল দর্শন দান করবেন মহারাজ, আসবেন আপনারা।

পুরোহিত আর রাজায় চললো গোপন শলাপরামর্শ। খুব বিশ্বাসী

তিরিশ জন সেনাকে ডাকিয়ে আনলেন তাঁরা। তাদের দিলেন কিছু গোপন নির্দেশ।

পরদিন রাজার সঙ্গে যথারীতি দেখা করতে এলো সব সেনাপতিরা। পুরোহিত পৌঁছে দিলেন তাদের আঁধার ঘরে রাজার কাছে। আলো-ছায়ার আঁধার ঘর। রাজাকে ভালো করে দেখা যায় না। বুঝতে পারা যায় শুধু রাজার শরীরটা যেন আগের তুলনায় অনেক বড়ো হয়েছে।

সবাই একবার প্রণাম করলো রাজাকে। মধুমাখা কথা বললেন রাজা সকলের সঙ্গে। এবারে বিদায়ের পালা। মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করবে সবাই আবার। রাজা ইঙ্গিত করলেন পুরোহিতকে, পুরোহিত ইশারা করলেন সেই বিশ্বাসী সেনাদের, যারা খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়েছিল আড়ালে। তারা ছুটে এসে এক এক খাঁড়ার ঘায়ে লুটিয়ে দিল এক এক সেনাপতির মাথা। সতেরোটা মাথা এক নিমিষে ধরছাড়া হল, চোদ্দ দেবতার সামনে যেন একসঙ্গে সতেরোটি ছাগ বলি হয়ে গেল। রক্তের গঙ্গা রাজার পা ছুঁয়ে বয়ে চললো। কাটা দেহগুলো সরিয়ে ফেলা হল রাতারাতি।

রাজার আদেশে অনুগত সেনারা সেনাপতিদের বাড়ি লুঠ করলো, মেরে ফেললো তাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের। সেনাপতিদের ঘরে কোনো আর বীর রইল না।

রাজ্য জুড়ে রাজঘোষক ঘোষণা করলো, রাজার অসুখ সেরে গেছে। পরদিন রাজা হাতির পিঠে চেপে সমস্ত রাজ্য ঘুরে এলেন। প্রজারা সবাই জানলো রাজা ভালো হয়ে গেছেন। হাজার হাজার সেনা এবারে রাজার কথায় চলবে।

সিংহাসনে বসেই ধন্যমাণিক্য ভাবলেন, বঙ্গদেশ জয় করবেন তিনি। মেহেরকুল, পাটীকারা, গঙ্গামণ্ডল এসব অনেক জায়গা সহজে দখল করে নিলেন তিনি। ভানুগাছ আর লঙ্গলাও এলো তাঁর অধিকারে। জমিদার প্রতাপ, গৌড়েশ্বরকে ছেড়ে, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে যোগ দিলেন।

যিনি ধন্যমাণিক্যকে মেনে নিলেন না তিনি হলেন খণ্ডলের রাজা।

ত্রিপুরা থেকে মহারাজ ধন্যমাণিক্য একজন সেনাপতিকে লস্কর করে পাঠালেন খণ্ডলে। ছোটো জায়গার শাসককে তখন বলা হত লস্কর।

বেশীদিন রইতে পারলো না সেনাপতি খণ্ডলে। জনগণ তাঁকে ধরে নিয়ে গেল গৌড়েশ্বরের দরবারে। গৌড়েশ্বর আদেশ দিলেন, 'হাতীর পায়ে পিষে মারো ওকে'।

সবাই লস্করকে নিয়ে চললো রাজার আদেশ পালন করতে। হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ যাবে তাঁর। লস্কর ভাবলো আমার মরণের আর দেরী নেই। এবারে বাঁচবার শেষ চেষ্টাটুকু করে দেখি।

অতর্কিতে সে একজন সেনার হাত থেকে কেড়ে নিল তলোয়ার। লম্ফ ঝম্ফ করে বিশ জন সেনাকে কেটে মাটিতে ফেললো। অঙ্কুশ ছুঁড়ে মেরে ফেললো হাতীর মাহুতকে। তলোয়ারের পাঁচটি আঘাত করলো হাতীর নাকে মুখে। রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালালো হাতী।

অন্য সেনারা এবারে নিয়ে এলো অন্য আরেক বিশাল হাতী। দাঁত দুটো তার ভীষণ বড়ো। দেহ দেখলে মনে হয় যমরাজ নিজেই এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

ভয় না পেয়ে লস্কর সে হাতীকেও আঘাত করলো। কিন্তু হাতীর দাঁতে লেগে তলোয়ারখানা গেল দু টুকরো হয়ে। আর সেই সুযোগে হাতীও রেগে গিয়ে লস্করকে দূরে ছুঁড়ে মারলো শুঁড়ে জড়িয়ে। হাতীর হাতেই প্রাণ গেল তার।

ধন্যমাণিক্যের কাছে পৌঁছলো এসে এসব খবর। ভীষণ রেগে গেলেন মহারাজ। এবারে তিনি কৌশলী বীর সেনাপতি রায় কাচাগকে পাঠালেন খণ্ডল জয় করতে।

সেনাপতি রায়কাচাগ ভাবলেন, শক্তিতে পেরে উঠবো না খণ্ডলদের সঙ্গে, কৌশল করতে হবে। এদিকে খণ্ডলের জমিদারও ত্রিপুরার এই নতুন সেনাদল দেখে ভয় পেল। ভাবলো, আপাততঃ ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে মিত্রতা করাই ভালো। জানালো সে সেনাপতি রায়কাচাগকে,

"আমরা মেনে নিলাম ত্রিপুরার মহারাজকে, সবাই মিলে ভেট নিয়ে যাবো একদিন মহারাজের দরবারে।"

তাই হল। হাজার হাজার সেনা নিয়ে, নানা উপঢৌকন নিয়ে, ত্রিপুরার রাজ দরবারে এলো খণ্ডলের জমিদার। কিন্তু কেউ ফিরে গেল না তারা আর। ত্রিপুরার সেনার হাতে প্রাণ হারাতে হল তাদের। প্রধান 'বসিককে' (শাসককে) কাটলেন মহারাজ নিজে, আর ত্রিপুরার হাজার হাজার সেনার হাতে প্রাণ হারালো হাজার হাজার খণ্ডলের সেনা। এরপর মহারাজ নিজে সৈন্য নিয়ে গিয়ে খণ্ডল দখল করে নিলেন।

● রায়কাচাগের থানাংছি জয়

কুকীরা বাস করে থানাংছিতে। ডাঙ্গর ফা যখন রাজা ছিলেন, থানাংছি তখন ছিল ত্রিপুরার অধীনে। কিন্তু ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে তারা ত্রিপুরার সঙ্গে হাত মেলালো না।

থানাংছিতে ছিল এক সুন্দর দুধ বরণের সাদা হাতী। হেরম্বের রাজা চেয়ে পাঠালেন সে হাতী। ভাবলেন, ওরা ভয়েই হাতীটা দিয়ে দেবে। আরো জানালেন তিনি, তোমরা এতোদিন মেনেছ ত্রিপুরার রাজাকে, এবার থেকে মানবে আমাকেই।

এ কথা শুনে কুকীদের রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। জানিয়ে দিলেন তিনি, তাঁরা কারো সেবক নয়, ত্রিপুরার রাজারও নয়, কাছাড়ের রাজারও নয়। তাঁরা স্বাধীন। আর হাতী নিতে হলে যুদ্ধ করতে হবে তাদের সঙ্গে। ত্রিপুরার রাজার কাছেও এসে পৌছলো এ-সংবাদ। মহারাজ ধন্যমাণিক্যও জানিয়ে দিলেন থানাংছিকে, "শ্বেত হস্তী হেরম্বরাজকে দিয়ে দাও।"

থানাংছির রাজা কারো কথাই শুনতে রাজী নয়, মানতে রাজী নয় কাউকে সে।

হেরম্বের রাজাই আগে থানাংছির রাজাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এগিয়ে এলেন। সেনা নিয়ে এসে থানাংছি ঘিরে ফেললেন তিনি।

পর্বতের উপরে থানাংছি রাজ্য। এখানে যেতে হলে একটি মাত্র পথ। অন্য সবদিক ঘিরে রেখেছে বন, পর্বত আর ঝর্ণা। যুদ্ধ চললো ছ'মাস। কিন্তু হেরম্বের সেনা থানাংছি গিয়ে পৌঁছতে পারলো না।

সংবাদ পৌঁছলো এসে ত্রিপুরায়। ধন্যমাণিক্য সেনাপতি রায়-কাচাগকে আদেশ করলেন থানাংছি অভিযান করতে। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি কুকী রাজ্য থানাংছির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

রায়কাচাগ রাজদূত পাঠালেন প্রথমতঃ। জানালেন, ত্রিপুরার রাজা মিত্রতা করতে চান কুকীরাজের সঙ্গে। কিন্তু সে পথে পা বাড়ালো না থানাংছির রাজা। উল্টো জানিয়ে দিল, পারো তো যুদ্ধ করে হাতী নিয়ে যাও।

যুদ্ধই লাগলো। রায়কাচাগ আট মাস যুদ্ধ করলেন হাজার ত্রিপুরী সেনা নিয়ে। পর্বতে ঘেরা কঠিন পথে কেউ এগিয়ে যেতে পারলো না। উঁচুতে পর্বতের মাথায় সেনানিবাস। ওখানে দাঁড়িয়ে কুকী সেনারা হাত পা ছুঁড়ে দেখিয়ে ত্রিপুরীদের টিটকিরি দেয়। বড়ো অপমান বোধ করলেন সেনাপতি রায়কাচাগ। কি উপায়ে কি করা যায় তাই ভাবতে লাগলেন তিনি রাতদিন।

ত্রিপুরী সেনাদের তিনি খুব করে গালাগাল করলেন। সেনাদের মনে আঘাত দিয়ে ওদের চাঙ্গা করে তুললেন রায়কাচাগ। আহত হলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকীদের উপর। সেনাদের ছাউনীর চাল ভেঙে দিলেন সেনাপতি। রোদ আর বৃষ্টির আঘাত লেগে সেনাদের মেজাজ ক্ষেপে উঠুক, বিরক্ত হয়ে যুদ্ধে ছুটে যাক ওরা।

দৈবও সহায় হলেন ত্রিপুরীদের। ত্রিপুরার সেনা ছাউনীর কাছে একদিন দেখতে পাওয়া গেল এক অতিকায় গোসাপ। লম্বায় আট হাত আর তিন হাত তার বুকের ছাতি।

সেনাপতি রায়কাচাগের মাথায় এক বুদ্ধি এলো। তাঁর আদেশে

গোসাপটাকে জ্যান্ত ধরে ফেলা হল। জোগাড় করা হল খুব লম্বা একটি পাহাড়ী বেত। সেই বেতের একদিক বাঁধা হল শক্ত করে গোসাপের কোমরে। এবারে ওকে ছেড়ে দেওয়া হল পাহাড়ের ঢালে। প্রাণের ভয়ে পাহাড়ের গা আঁকড়ে তরতর করে উঠে যেতে লাগলো উপরে। বেতের অন্য দিকটা ধরে রয়েছে ত্রিপুরী সেনারা।

অনেক উঁচুতে উঠে বিশাল এই গোসাপ দেখলো আর যাবার যো নেই, কোমরে তার বেত বাঁধা। তখন সে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রইল গাছের শেকড়বাকড়, যেন কেউ আর তাকে টেনে না নামাতে পারে। এ রকমই ভেবেছিলেন রায়কাচাগ। এবারে বেতের এপ্রান্ত ধরে এক একজন করে অনেক ত্রিপুরী সেনা উপরে উঠে গেল। কেউ জানতে পারলো না।

কুকী সেনারা তখন বিশ্রাম করছে। প্রচুর ভোজের পর আনন্দে মেতেছে তারা। জানে তারা, ত্রিপুরীরা উপরে উঠে আসতে পারবে না কিছুতেই। মদের নেশায় তাদের নয়ন ঢুলু ঢুলু। ওরা একটুও ভাবতে পারেনি ত্রিপুরী সেনা তাদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁচেছে।

রাত শেষ প্রায়। কুকী সেনারা তখনো ঘুমিয়ে। হঠাৎ কারা তাদের গড় আক্রমণ করলো। চোখ মেলে ভালো করে তাকাবার সময় হল না তাদের, ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল। রক্তের বন্যা বয়ে গেল গড়ের ঘরে ঘরে। শুধু বেঁচে রইল কিছু নারী আর শিশু। থানাংছি দখল করে নিল ত্রিপুরী সেনারা।

সেনাপতি রায়কাচাগ সব খবর জানিয়ে মহারাজ ধন্যমাণিক্যকে চিঠি দিলেন। থানাংছি জয়ের পর যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছিল সব পাঠিয়ে দিলেন তিনি রাজ দরবারে।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য খুব খুশী হলেন। তিনি সেনাপতি রায়কাচাগ আর ত্রিপুরী সেনাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন নানা পারিতোষিক।

রায়কাচাগ তারপর গেলেন কিরাত রাজ্যে। সে দেশের রাজা সহজেই ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে করলেন বন্ধুত্ব। অনেক ভালো ভালো জিনিস পাঠালেন ত্রিপুরার রাজাকে।

● গৌড়ের রাজা হুসেন শাহ ও ধন্যমাণিক্য

মহারাজ ধনমাণিক্য চট্টগ্রাম দখল করে নিলেন। গৌড়ের রাজার যতো সেনা ছিল চট্টগ্রামে সব তাড়িয়ে দিলেন মহারাজ। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ এ-কথা জেনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। গোড়াই মল্লিককে তিনি পাঠালেন সেনাপতি করে, সঙ্গে চললো হাতী ঘোড়া সেনা-সামন্তের দল। গোমতী নদীর জলে ভেসে চললো অসংখ্য নৌকো, সেনা বয়ে নিয়ে। চট্টগ্রাম আবার দখলে আনবেন গৌড়েশ্বর।

গৌড়ের সেনারা মেহেরকুল দখল করে নিল সহজেই। ত্রিপুরী সেনারা ঘাঁটি বাঁধলো এসে চণ্ডীগড়ে। মেলাঘর আর কাঁকড়াবনের মাঝে চণ্ডীগড়। গোড়াই মল্লিক কিছুতেই আর দখল করতে পারলো না এ গড়।

চণ্ডীগড় দখলে থাকলেও ভাবনা রইল ত্রিপুরার সেনা সেনাপতিদের। গৌড়ের সেনার সংখ্যা তো কম নয় ; আর তারা তো আসছে জলে-স্থলে সবদিকে। রুখতে তো হবে তাদের যে-কোনো উপায়ে।

সোনামুড়ার ভাটিতে গোমতীর বুকে বাঁধ দেওয়া হল। সে-কথা জানতে পারলো না গৌড়ের সেনা সেনাপতিরা। বাধা পেয়ে গোমতীর জল বাঁধের উজানে ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো। ভাটিতে জল শুকিয়ে উঠলো প্রায়। গৌড়ের সেনাদল দেখলো গোমতীতে জল নেই তেমন। তাদের অনেক সেনা নেমে এলো গোমতীতে। তিনদিন এ-ভাবে গোমতীকে বেঁধে রাখতে ভাটির দিকে আর জল রইল না মোটেই। গৌড়ের শত শত সেনা ভয়-ভাবনা ছেড়ে নদীর

বুকে এলো নেমে, ঘুরতে-ফিরতে লাগলো।

ত্রিপুরার পাহাড়ী নদীগুলো বড়োই খেয়ালি, বড়ো দুরন্ত। বাংলাদেশের নদীর মতো তাদের শরীরটা চওড়া নয় মোটে, গড়ন তাদের ছিপছিপে, চলন তাদের খুব দ্রুত। এমনিতে খরার সময় নদীগুলো চুপচাপ পড়ে থাকে, যেন মরা সাপ। পাহাড়ে ঢল নামে, তার খবর পেয়ে আনন্দে ফুলে-ফেঁপে ওঠে নদী। কল কল শব্দে গায়ের সব শক্তি নিয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলে সমতলের দিকে। পথে যা পায় তা-ই নিয়ে যায় ভাসিয়ে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না আর।

ত্রিপুরার বড়ো নদী গোমতী। পাহাড়ের প্রচুর জল সে বয়ে নিয়ে যায় বাংলাদেশের দিকে। তিন দিনের বাঁধনে গোমতী খুব রেগে রইল, বাঁধন ভাঙলেই ছুটে চলবে দারুণ বেগে।

কোনো এক রাতের গভীরে ত্রিপুরী সেনারা গোমতীর বাঁধ ভেঙে দিল। গর্জন করে ছুটে চললো বাঁধ-ভাঙা গোমতী। ভাসিয়ে নিয়ে চললো শত শত গৌড়সেনা। পাঠান সেনারা এরকম একটি ঘটনার কথা ভাবেনি কখনো। স্রোতে ভাসতে ভাসতে রেগে গিয়ে তারা জলের সঙ্গে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করতে লাগলো। চাবুক মারতে লাগলো জলের স্রোতে। কিন্তু বাঁচবার কোনো আর পথ রইলো না তাদের। গৌড় মল্লিকের অভিযানের মাথা হেঁট হল ত্রিপুরার রণকৌশলের কাছে।

হুসেন শাহের কাছে পৌঁছলো গিয়ে সব খবর। খুব অপমানিত বোধ করলেন তিনি। এবারে আর গৌড় মল্লিক নয়, এবারে পাঠালেন হৈতন খাঁকে সেনাপতি করে।

রাঙ্গামাটি জয় করতে চললেন হৈতন খাঁ। সঙ্গে তাঁর একশ' হাতি, পাঁচ হাজার ঘোড়া, এক লক্ষ পায়ে হাঁটা সেনা। হাতে তাদের তীর-ধনুক। বাংলার বার ভুঁইয়ারাও চললেন হৈতন খাঁর সঙ্গে। অবনী কাঁপিয়ে চললো হৈতনের বাহিনী।

সরাইলের পথে কসবা হয়ে বিশাল গড়ে এসে পৌঁছলো হৈতনের অনুচরেরা। সকালবেলা জামির খাঁর গড়ে এসে উঠলো পাঠান সেনারা। সেখানে ছিলেন ত্রিপুরার বীর খড়গ রায় ত্রিপুর এবং আরো অনেকে। যুদ্ধ করে হৈতন খাঁ দুর্গ দখল করে নিলেন, ত্রিপুরার সেনারা প্রাণে মারা গেল।

সামনেই ছ'খড়ির গড়। সেখানে আছেন ত্রিপুর সেনাপতি গগন খাঁ। এগিয়ে এলেন তিনি, বাধা দিলে বিদেশীদের। পাঠান সেনাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হল তার। তিন প্রহর কঠিন যুদ্ধ করবার পর হৈতন খাঁ প্রাণ নিয়ে পালালেন গভীর বনে। ছ'খড়িয়ার গড়ের পতন হল।

যশপুর হয়ে গঙ্গানগর আর ডোমঘাটির পথ। হৈতন খাঁ সেখানে শিবির করলেন। এক সঙ্গে বহু লোক লাগিয়ে দু' প্রহরের মধ্যে প্রকাণ্ড এক দীঘি খুঁড়লেন হৈতন, পাঠান সেনারা দীঘির জল পান করবে। হৈতনের মনে ভয়, ত্রিপুরীরা যদি বিষ মিশিয়ে দেয় নদীর জলের ধারায়। হৈতনের এ দিঘীর নাম হল 'তুড়ুক-দীঘি'।

রাজা ধন্যমাণিক্য আশ্রয় নিলেন এসে 'ছনগাঙ্গে'। সঙ্গে তাঁর ত্রিপুর সেনাবাহিনী। 'ছনগাঙ্গের' কয়েক বাঁক উজানেই 'মাছি ছড়া'। হৈতন সেখানে সেনা ছাউনী তৈরী করলেন। পাহাড়ের উপর থেকে সে ছাউনী ভালো করে দেখে নিল ত্রিপুরী সেনারা। ধন্যমাণিক্য নিজেও দেখতে গেলেন সে ছাউনী পাহাড়ের উপর থেকে।

মাথার উপর দুপুরের সূর্য। ক্লান্ত মহারাজ গাছের ছায়ায় বসলেন এসে। ত্রিপুরার বনে বনে তখন ডাইনীদের বাস। তারা জানে অনেক রকমের মন্ত্র, যা দিয়ে খুব কঠিন কাজও সহজে করা যায়। মহারাজ ডাকালেন সেই ডাইনীদের। বললেন তাদের, "তোমরা তো জানো অনেক কিছু, রাজ্যের মানুষদেরও তো মারো কারণে অকারণে। এবারে রাজ্যের শত্রুদের উপর খাটাও না তোমাদের জারিজুরি।"

ডাইনীদের মধ্যে একজন একথা শুনে এগিয়ে এসে নমস্কার

করলো মহারাজকে। নাম তার বলাগামা, বয়সে সে যুবতী। বললো সে, "অনুমতি করো মহারাজ, আগামী মঙ্গলবারে আমি মন্ত্র পড়ে গোমতীর জল বেঁধে রাখবো। সাতদিন আর ছনগাঙ্গের ভাঁটি পথে জল বইবে না।" বলাগামার কথা শুনে খুব খুশী হলেন মহারাজ। অনুমতি দিলেন তাকে গোমতীর জল বাঁধবার।

বলাগামা মঙ্গলবার রাতে তার দুই হাতে বাঁধলো দুই কুলো। কুলো উড়িয়ে পাখীর মতো আকাশে উড়ে গেল সে। দু'শ হাত উপরে উঠে ঝাঁপ দিল সে নদীর মাঝখানে। নদীতে ডুবে গেল বলাগামা। উঠলো না আর। এদিকে অল্প পরেই নদীর জলের গতির ধারা গেলো উল্টে। উজান বইতে লাগলো নদী। ভাটিতে পড়লো চরা। হৈতনের পাঠান সেনারা ভাবলো, তাদের বসবাসের সুবিধের জন্যই বুঝি গোমতীতে চর পড়েছে। নদীর বুকে তাঁবু খাঁটিয়ে বসবাসের ঘর বানালো পাঠানরা। মহা আনন্দে কাটলো সারাদিন। রাত হল। দিনের হুল্লোড়ের পরে রাতের গভীরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো নিশ্চিন্তে।

ত্রিপুরার সেনা ছাউনীতে তখন ভীষণ ব্যস্ততা। সাজো সাজো রব। শত শত ভেলা তৈরী করেছে তারা; পাহাড়ী কলাগাছ আর বাঁশ দিয়ে। প্রতিটি ভেলাতে দাঁড় করিয়ে দিল তিনটি করে বড়ো মানুষের চেহারার পুতুল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে তিনজন করে মানুষ দাঁড়িয়ে এক-একটি ভেলায়। মানুষের পুতুলগুলোর হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল দুটো করে মশাল। ছ'টি মশাল হাতে তিনটি করে মানুষ দাঁড়িয়ে রইল যেন এক-একটি ভেলায়।

নদীর তীরে তীরে বন। বনে বনে লোক পাঠানো হল। সময় মতো তারা বনেও আগুন লাগিয়ে দেবে।

রাত গভীর। পাঠান সেনারাও গভীর ঘুমে। বলাগামা এবারে ধীরে ধীরে উঠে এলো নদীর জল থেকে। নদীর জলের গতি আবার গেল পাল্টে। বন্যায় ভেসে চললো শত শত ভেলা, সহস্র সহস্র

মশাল। আগুন জ্বলে উঠলো নদীর তীরে তীরে, বনে বনে। হঠাৎ যেন জলে-স্থলে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। সেনাদের ঘুমের ঘোর ভাঙতে না ভাঙতেই জলের তোড়ে ভেসে চললো তারা। হাতে অস্ত্র তুলে নেবার অবসর পেলো না কেউ। পোশাক পরবার সময় পেলো না কেউ। কোনো রকমে আল্লার নাম মুখে নিয়েই ডুবে যেতে লাগলো জলের তলে। পাঠানেরা অনেকেই সাঁতার কাটতে জানে না। দু' একজন যারা মাথা তুলে উঠলো, ভেলা থেকে ত্রিপুরার সেনারা মাথায় মারলো ডাণ্ডা। এভাবেই তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নদীর তীর ধরে ছুটে এলো ত্রিপুরী সেনার দল।

পাঠানেরা আগুনে জলে আচমকা ভয় পেয়ে গেল। পালাতে লাগলো যে যেদিকে পারলো। হাতী পড়ে রইল হাতিয়ারসহ, পড়ে রইল ঘোড়া, পোশাক-আশাক, অস্ত্র-শস্ত্র। সব দখল করে নিল ত্রিপুর সেনারা। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো সেনাপতি হৈতন খাঁ, আর তার সহকারী করা খাঁ। হৈতন খাঁ শুধু পালিয়ে যাবার পথে কিছু সেনা মেরে কেটে গেল

যুদ্ধ জয়ের পরে মহারাজ ধন্যমাণিক্য ঘটা করে চতুর্দশ দেবতার পুজো দিলেন। এক মন সোনা দিয়ে তৈরী করালেন ভুবনেশ্বরী মায়ের মূর্তি। সাধক এনে মায়ের পুজোর আয়োজন করলেন গোমতীর তীরে মন্দির বানিয়ে। এ-ছাড়া তিনি তৈরী করালেন বিষ্ণু মঠ।

একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন মহারাজ ধন্যমাণিক্য, দেবী ভগবতী বলছেন ডেকে মহারাজকে, "আমি রয়েছি চাটগাঁয়ে পাথরের মূর্তিতে। আমাকে তুমি সেখান থেকে নিয়ে এসো, বসাও এনে ত্রিপুরার মঠে। আমি ত্রিপুরাতে থাকতে চাই, পুজো পেতে চাই।"

রসাঙ্গ মর্দন নারায়ণকে পাঠালেন মহারাজ চট্টলে। স্বপ্নই সত্য হল, স্বপ্নের সেই জায়গাতেই মাকে পাওয়া গেল পাথরের মূর্তিতে। উৎসব করে, মঙ্গল বাদ্য বাজিয়ে মাকে আনা হল ত্রিপুরায়। রাজপ্রাসাদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ধুলোয় লুটিয়ে প্রণাম করলেন মাকে মহারাজ

ধন্যমাণিক্য।

মায়ের মন্দির গড়া হল কিছুদিন পরে। নতুন মন্দিরে মাকে বসালেন মহারাজ। সেই থেকে মা ত্রিপুরা-সুন্দরী রয়েছেন উদয়পুরে, দক্ষিণ ত্রিপুরায়। সেখানেই মায়ের বাড়ি। ত্রিপুরার মানুষ বলে' 'মাতাবাড়ি'।

আরো চারটি মঠ তৈরী করালেন ধন্যমাণিক্য দক্ষ কারিগরদের দিয়ে। বিষ্ণুমন্দির, ঝুলনমন্দির, হরিমন্দির, এসব ধন্যমাণিক্যই করিয়েছিলেন, তাঁরই কীর্তি এই মন্দিরগুলো।

অনেকদিন সুখে রাজত্ব করলেন ধন্যমাণিক্য। এরপর মহারাজের হল মায়ের দয়া, কঠিন বসন্ত রোগ। ইহলোকে আর রইলেন না তিনি।

মহারানী কমলা পতির সঙ্গে চিতায় উঠলেন। তখনকার দিনে ছিল সহমরণ প্রথা। সতীরা পতির সঙ্গে মরণ বরণ করতেন আগুনের শিখায়।

● তান্ত্রিক লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহারাজ দেবমাণিক্য

ধন্যমাণিক্যের পর রাজা হলেন তার ছেলে দেবমাণিক্য। অনেক দান ধর্ম করলেন তিনি সিংহাসনে বসে, গেলেন নানা তীর্থস্থানে। অনেক দিন পরে ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

মিথিলার এক সন্ন্যাসী দীক্ষা দিলেন রাজাকে। নাম তার লক্ষ্মী-নারায়ণ। তিনি একজন বড়ো তান্ত্রিক।

দীক্ষা নেবার পর মহারাজ শ্মশানে মশানে ঘুরতে লাগলেন। মড়ার উপর বসে শবসাধনা করতে লাগলেন রাতের পর রাত। গুরু বলেছেন দিতে হবে নরবলি তবে মা করালী দেখা দেবেন ভক্তকে। মহারাজ মা কালীকে দেখতে চান। তাই তিনি সন্ন্যাসীর সব কথাতেই রাজী।

তা-ছাড়া মায়েরই আদেশ নরবলি দেবার। সন্ন্যাসী বললেন, "ধ্যানে বোসো, মায়ের আদেশ শুনতে পাবে।"

মহারাজ ধ্যানে বসলেন। এদিকে রাজার গুরু 'বাস্থুয়া' নামে এক ব্রাহ্মণকে বসিয়ে রেখেছে কাছেই এক গাছের উপর। সেখান থেকে সে রাতে গভীর আঁধারে নাকি সুরে বললো রাজাকে, "তোর সব সেনাপতিদের একে একে এনে এই মহাশ্মশানে বলি দে, আমি তোর সামনে এসে দেখা দেব।"

মায়ের দেখা চাই-ই। রাজা দেবমাণিক্য একে একে সব সেনাপতিদের বলিদান করলেন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু তবুও মায়ের দেখা নেই। এবারে হতাশ হলেন রাজা, সোনার শরীরখানা কালো হল তার।

একদিন স্নানের ঘরে স্নান করতে গেলেন দেবমাণিক্য। রাজা তখন একলা। সুযোগ বুঝে একজন বুড়ো রাজকর্মচারী এগিয়ে গেলেন গোপনে ছুটি কথা বলবেন বলে। বিশ্বাসী সেই রাজকর্মচারী বললেন রাজাকে, "একি করছো মহারাজ, তোমার বাবার আমলের সব সেনাপতিদের কাটলে শ্মশানে নিয়ে? বীরশূন্য করলে ত্রিপুরা রাজ্যকে? খবর শুনে তো তোমার দুশমনরা হাসছে। দুষ্ট ব্রাহ্মণ তোমাকে মজালে।"

কিছুটা চৈতন্য হল বটে রাজার। কিন্তু শ্মশানের সাধনা চললো ঠিকই। মায়ের দেখা পেতে হবে তাঁর—ভীষণে মধুরা মহাকালিকাকে দর্শন করতে হবে। মা, মা, বলে কাঁদেন আর বলেন মহারাজ, "কবে তোর করুণা হবে মা, কবে দেখা দিবি।"

এদিকে রাজ্যের মানুষ আর রাজকর্মচারীরা এই নিয়ে কানাঘুষো করছে। অনেকেই বলছে এই তান্ত্রিকই সব অনর্থের মূল।

সব রটনা গিয়ে পৌঁছলো সন্ন্যাসী লক্ষ্মীনারায়ণের কানেও। ভাবলো সে, আটজন বাঘা বাঘা সেনাপতিকে বলি দেওয়া হয়েছে, এবারে মহারাজকে খতম করলেই সব কাজ সমাধা, আমিই হবো ত্রিপুরেশ্বর। এ-ছাড়া উপায়ও নেই কোনো। কারণ প্রজারা টের পেয়ে গিয়েছে

কিছুটা তার ছলাকলা।

গভীর রাত। শ্মশানে আসন করে চক্ষু বুজে মা মা বলে ডাকছেন মহারাজ। বলছেন, "দেখা দে মা, সন্তানের হৃদয়ের আঁধার দূর করে দে।" মহারাজের মনে আশা আজই এই রাতের আঁধার আলোয় ভরে দেখা দেবেন মহাকালী। কিন্তু রাজার চক্ষু আরো অন্ধকারে ডুবে গেল। তার মাথায় এসে পড়লো গুরুর হাতের গুরু আঘাত। ঢলে পড়লেন মহারাজ। শ্মশানেই তাঁর মরণ হল।

ভোর হল। প্রজাদের ডেকে শ্মশানে নিয়ে এলেন লক্ষ্মীনারায়ণ তান্ত্রিক। বললেন, "রাজা ভয় পেয়ে মারা গিয়েছেন। সাধনায় তাঁর সিদ্ধির বেশী দেরী ছিল না। মা তাই আগে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ভূত-প্রেত পিশাচের দল, ভক্তের মনের বল পরীক্ষার জন্য। কিন্তু তাদের দেখেই রাজার মাথা গেল ঘুরে, আসন থেকে পড়ে গেলেন তিনি, আর উঠলেন না।

তান্ত্রিকের কথাই বিশ্বাস করলো সবাই। মা ছলনাময়ী, ভক্তদের নিয়ে তিনি খেলা করেন। মায়ের কোলেই চলে গেছেন মহারাজ।

মহারানী পতির চিতায় প্রাণ দিলেন। তাঁর ছেলে বিজয়কুমার বেঁচে রইল।

ছোটোরানী বেঁচে আছেন, পতির চিতায় ওঠেন নি। তাঁর সঙ্গে সড় করেই এতো সব ঘটিয়েছে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। এবারে সে ত্রিপুরার শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নিল। রাজকুমার বিজয়মাণিক্যকে পাঠিয়ে দিল হীরাপুর গ্রামে। সেখানে তাঁকে রাখা হল কয়েদ করে। আর রাজা করা হল ছোটো রানীর ছেলে ইন্দ্রমাণিক্যকে।

ইন্দ্রমাণিক্য খেলার পুতুলের মতো বসে রইলেন সিংহাসনে, সব রাজ কাজ চালাতে লাগলো দুষ্ট বামুন লক্ষ্মীনারায়ণ। তার শাসনে ত্রিপুরার মানুষ একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো, এতোই অত্যাচারী সে।

ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি এ সময় দৈত্যনারায়ণ। তিনি রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার সাক্ষী। তিনি এক পরিকল্পনা করলেন এই দুষ্ট

বামুনকে শেষ করে দেবার।

একদিন গভীর রাতে লক্ষ্মীনারায়ণকে খবর পাঠানো হল, মহারানীর বড়ো অসুখ, আপনি এসে নিজের চোখে একটিবার দেখে যান।

তান্ত্রিক ভাবলো, 'সকাল বেলা ভালো দেখে এলাম রানীকে ; হঠাৎ কি করে অসুখ হল তার ? যাই, দেখেই আসি কি ব্যাপার।' চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ্মীনারায়ণ চললো রানীর বাড়ির দিকে।

যাবার পথে পড়বে তারাঘাট। সেখানে লোকলস্কর বসিয়ে রেখেছেন সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ। নদী পার হয়ে তারাঘাটে এসে উঠতেই সেনারা সব ঘিরে ধরলো লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরকে। সেখানেই তারা তাকে শূলে চড়ালো। শূলে চড়ে মরবার আগে অদ্ভুত এক মন্ত্র পড়লো তান্ত্রিক অনেকক্ষণ ধরে।

তান্ত্রিক মরলো। এবারে ইন্দ্রমাণিক্য আর রাজমাতার পালা। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ সৈন্য নিয়ে ছুটে গেলেন ইন্দ্রমাণিক্যের কাছে। তাকে ধরে অনেক উঁচু থেকে আছড়ে ফেললেন অনেক নীচুতে। এভাবে তার ভবলীলা শেষ হয়ে গেল।

মিথিলার আড়াইশ সেনা এসে ডেরা বেঁধেছিল ত্রিপুরার বুকে। যুদ্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন আবার মিথিলায়। রাজমাতাকে ঘিরে ধরলো অনেক মানুষ। তাদের হাতেই তাকে মরতে হল।

এবারে দৈত্যনারায়ণ ছুটলেন বিজয়মাণিক্যের সন্ধানে হীরাপুর গ্রামে। তাঁকে নিয়ে এলেন ত্রিপুরায়। রাজা হলেন বিজয়মাণিক্য, রানী হলেন পুণ্যবতী। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা তিনি।

● সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ ও বিজয়মাণিক্য

নামে মাত্র রাজা রইলেন বিজয়মাণিক্য। রাজ্য চালাতে লাগলেন সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ। জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার মূর্তি গড়ালেন তিনি। আদি জগন্নাথ আছেন উড়িষ্যার পুরীর মন্দিরে ; আছেন আদি সুভদ্রা ও বলরাম। তিনি তাঁদের ছোঁয়া লাগিয়ে আনলেন নতুন গড়া মূর্তিগুলোতে। তাঁদের বসানো হল ত্রিপুরার মন্দিরে।

বিজয়মাণিক্যের বয়স তখন ষোলো বছর। কোনো স্বাধীনতা নেই তাঁর। দৈত্যনারায়ণের ভাই দুর্লভনারায়ণ নানা রকম অত্যাচার করতে লাগলো প্রজাদের ওপর। বিজয়মাণিক্য সব দেখেন শোনেন, মনে কষ্ট পান, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেন না কোনো।

সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের বড়ো জামাই মাধব। তার সঙ্গে বিজয়মাণিক্যের বেশ ভাব। একদিন মাধবকে ডাকালেন বিজয়। দুজনে পরামর্শ হল। কথা হল ভূষণায় গিয়ে থাকবেন মাধব। কৌশলে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে দৈত্যনারায়ণকে। সেখানেই তাকে মেরে ফেলা হবে। তবে রাজরানী পুণ্যবতীর জন্যই একটু ভাবনা। তিনি জানতে পারলে রক্ষা নেই। তাঁর পিতাকে যে মারবে তারও মরণ চাইবে সে।

বিজয়মাণিক্য বলে দিলেন মাধবকে, "তুমি ভূষণাতেই থাকবে। আমার হাতের হীরার আংটিটা দেখে রাখো। এ আংটি তোমায় কেউ দেখালে বুঝবে আমি তোমায় ডেকেছি। নয়তো কারো কথায় এদিকে এসো না তুমি, বিপদ হবে। তাদের এই পরামর্শ লুকিয়ে শুনে নিলেন রানী পুণ্যবতী।

মাধবের আমন্ত্রণে দৈত্যনারায়ণ এলেন ভূষণায়। খুব বড়ো রকমের ভোজের ব্যবস্থা হল। ভূরি ভোজনের পর মদ খেয়ে মাতাল হল দৈত্যনারায়ণ। আর সেই সুযোগে তার গলা কেটে ফেললো মাধব। দৈত্যনারায়ণের থাকবার ঘরে লাগিয়ে দেওয়া হল আগুন। প্রচার করা হল সেনাপতি আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।

বিজয়মাণিক্য রাজা হলেন; কথায় এবং কাজে। সকল সৈন্য সেনাপতি তাঁর অধীন হল। ভালো ভাবে রাজ্য চালাতে লাগলেন বিজয়মাণিক্য।

রানী সুযোগ খুঁজতে লাগলেন তাঁর বাবাকে যে মেরেছে তাকে শাস্তি দেবার। অবশেষে একদিন সুযোগ মিললো। সেদিন মহারাজ ভোরবেলা বেরিয়েছেন পশুশিকারে। হাতের হীরার আংটিখানা ভুলে ফেলে গেছেন বিছানায়। রানী কুড়িয়ে নিলেন সে আংটি। বিশ্বাসী এক অনুচরকে পাঠালেন আংটি দিয়ে ভূষণায় মাধবের কাছে।

আংটি দেখে মাধব ভাবলো, রাজা নিশ্চয়ই তাঁকে ডেকেছেন। চললেন তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। প্রাসাদে ঢুকবার পথের ধারেই লুকিয়ে ছিল রানীর লোক। মাধব সে-পথে পা বাড়াতেই তলোয়ার দিয়ে তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলা হল। রানীর মনে শান্তি এলো এতদিনে।

পরে বিজয়মাণিক্য জানতে পারলেন সব বৃত্তান্ত। খুব রেগে গেলেন তিনি রানীর ওপর। তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বনে।

বিজয় এবারে মন দিলেন কি করে রাজ্য আরো বড়ো করতে পারেন সেদিকে। পাশেই শ্রীহট্ট জেলা। রাজ্যের নাম জয়ন্তী। ত্রিপুরার সেনাবাহিনী এগিয়ে চললো জয়ন্তী জয়ে। ত্রিপুরার সেনাদের দেখে ভয় পেয়ে গেলেন জয়ন্তীরাজ। জানালেন তিনি, চিরকাল ত্রিপুরার মহারাজের আদেশ নির্দেশই মেনে চলবেন তিনি। জয়ন্তীর রাজা ত্রিপুরার রাজাকে ভেট পাঠালেন সুন্দর সুন্দর জিনিস। মহারাজ বিজয়মাণিক্যও খুশী হয়ে পাঠালেন ছোট্ট বাচ্চা-সহ একটি হাতী

জয়ন্তীরাজকে।

জয়ন্তীর রাজা মোটেই ভালো মানুষ ছিলেন না। রাজ্যে প্রচার করলেন তিনি, ত্রিপুরার রাজা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাকে হাতী নজরানা দিয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

এ-কথা কানে এলো মহারাজ বিজয়মাণিক্যের। তিনি তো একেবারে রেগে আগুন। বাইরে কাউকে কিছু বললেন না তিনি, মনে মনে ভাবলেন, এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

হাড়ীর দল গড়লেন বিজয়মাণিক্য। হাতে তাদের কোদাল বা খন্তী, আর একটি করে শূকর তাড়াবার লাঠি। যুদ্ধের বাজনা হল ডুগডুগি। ডুগ ডুগ ড্গ ডুগডুগি বাজিয়ে, খন্তী কোদাল লাঠি হাতে হাজার হাজার হাড়ী সৈন্য এগিয়ে চললো জয়ন্তীর দিকে। বড়ো রকমের অপমানিত হলেন জয়ন্তীর রাজা। হেরম্বরাজকে বললেন তিনি সে-কথা। হেরম্বরাজের কথায় বিজয়মাণিক্য ফিরিয়ে নিলেন তাঁর হাড়ী সেনার দল।

● বিজয়মাণিক্যের চট্টগ্রাম অভিযান

মহারাজ বিজয়মাণিক্য চাটগাঁ দখলে এনেছিলেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা পরে আবার চাটগাঁ দখল করে নিলেন। ত্রিপুরার সেনারা যুদ্ধে হেরে গেল।

এ সময় শ্রীহট্টে ছিলেন কালনাজীর। ত্রিপুরার বড়ো একজন বীর তিনি। রাজার আদেশে শ্রীহট্ট শাসন করছিলেন তিনি। তাঁকে এবারে ডেকে পাঠালেন মহারাজ বিজয়মাণিক্য। বললেন, তুমিই এবারে পাঠানদের তাড়াবে চাটগাঁ থেকে।

অনেক সেনা সঙ্গে নিয়ে চাটগাঁ গিয়ে পৌছলেন কালনাজীর।

ভীষণ লড়াই লাগলো। বন্দুক আর কামানের আওয়াজে কানে তালা লাগবার জোগাড়। রক্তের নদী বইল। ত্রিপুরী সেনাদের সঙ্গে শত শত হাতী। হাতীগুলোর গতি দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে মাটির উপর। পাঠানরা মরছে আর ত্রিপুর সেনা দিচ্ছে জয়ধ্বনি। আকাশে বাতাসে বনে বনান্তরে মহা কোলাহল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হঠাৎ পাঠান সেনার এক আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সেনাপতি নাজীর। হায় হায় করতে লাগলো সব ত্রিপুরী সেনা। পাঠান সেনারা দিক দিগন্ত কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি করলো। ত্রিপুরী সেনারা সব মরণের ভয়ে সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিল। বনে বাদাড়ে লুকোলো সকলে। পাঠান সেনারা ভাবলো, তাদের জয় হয়েছে। শিবিরে ফিরে বিশ্রাম আর আমোদে মাতলো সবাই।

পর্বতের আড়ালে সভা বসালো ত্রিপুরী সেনারা। বলছে সবাই, ফিরে গিয়ে আর কি হবে? পরাজয়ের মুখ নিয়ে কি করে দাঁড়াবো গিয়ে মহারাজের সামনে? ওর চাইতে মরণই ভালো। চলো আমরা যুদ্ধ করেই মরবো।

ত্রিপুরী দলপতি এক ফন্দি আঁটলো। পাঠানদের সেনা ছাউনীর একটা দিক জঙ্গলে ঘেরা। গোপনে তারা মাটির নীচ দিয়ে সেইদিকেই এক সুড়ঙ্গ খুঁড়তে লাগলো। সুড়ঙ্গের অপর দিকটা উঠলো গিয়ে একেবারে গড়ে ঢুকবার মুখে।

এ পথে ত্রিপুরী সেনারা একে একে পাঠান সেনাদের গড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। আরামে ঘুমিয়ে সব পাঠান সেনা। এমন করে দুশমন এসে শিয়রে দাঁড়াবে সেকথা তারা ভাবেনি স্বপ্নেও।

মার মার কাট কাট শব্দে পাঠানেরা অবাক হয়ে চোখ মেললো। একি তারা স্বপ্ন দেখছে? কিছু বুঝে উঠবার আগেই পটাপট তাদের মাথা কাটা পড়তে লাগলো। চোখ না মেলতে, ঘুম না ভাঙতে তাদের জীবনের খেলা হয়ে গেল শেষ। শিবিরে দামামা বেজে উঠলো। সহজেই শিবির হল দখল, জয় হল ত্রিপুরার। পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ

বন্দী হলেন। ত্রিপুরায় আনবার পথে মারা গেলেন তিনি।

অনেক ধন রত্ন পেলো ত্রিপুরী সেনারা। পেলো অনেক হাতী, ঘোড়া, আর পাঁচশ সোনার তৈরী কুমড়ো। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কাছে পৌঁছলো এসে সব ধনরত্ন।

● মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজ্যলাভ

বিজয়মাণিক্য গণৎকারের গণনায় জানতে পারলেন ছোটো ছেলে অনন্তমাণিক্য হবে ত্রিপুরার রাজা। বড়ো ছেলের ভাগ্য বড়ো খারাপ। তাঁকে তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন ওড়িষ্যার জগন্নাথ ধামে। জায়গাজমি কিনে দিলেন, দিলেন অনেক টাকাকড়ি।

বিজয়মাণিক্যের ছোটো ছেলে অনন্তমাণিক্য হলেন ত্রিপুরার রাজা। প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের মেয়েকে বিয়ে করলেন তিনি। সে হল পাটরানী।

কিছুদিন পরেই মারা গেলেন বিজয়মাণিক্য। গোপীপ্রসাদই হলেন রাজ্যের বিধাতা। সব কাজ চলতে লাগলো তার কথাতেই। অনন্তমাণিক্য নামে-মাত্র রইলেন রাজা। তিনি খাবার খেতেন গিয়ে শ্বশুরবাড়ি।

অবশেষে গোপীপ্রসাদের ভাগনে মর্দননারায়ণের হাতে অকালে প্রাণ হারালেন অনন্ত। এবারে "উদয়মাণিক্য" নাম নিয়ে রাজা হয়ে বসলেন গোপীপ্রসাদ। প্রজাদের উপর চলতে লাগলো নানা রকম অত্যাচার অবিচার।

গৌড়ের রাজা এসব খবর পেলেন। ভাবলেন তিনি, চট্টগ্রামটা আবার এই সুযোগে দখল করে নিতে হবে। উদয়মাণিক্যও গৌড়ের সেনাদের বাধা দেবার জন্য সেনাপতি করে পাঠালেন রণাগন নারায়ণকে। সঙ্গে গেলেন চন্দ্রদর্প, চন্দ্রসিংহ, গজভীম।

যুদ্ধ বাঁধলো। পরাজয় হল ত্রিপুরী সেনার।

এবারে যুদ্ধ করতে গেলেন উড়িয়ানারায়ণ। এভাবে যুদ্ধ চললো পাঁচ বছর। গৌড়ের তুই বড় বীর এলেন যুদ্ধ চালাতে। নাম তাঁদের পীরোজ খাঁ আর জামাল খাঁ। উড়িয়ানারায়ণের কামানের মুখে প্রাণ হারালেন ওঁরা।

দেশে শান্তি নেই। উদয়কে কেউ আর ভালো বাসছে না। সবাই মিলে ভাবলো, কি করে মেরে ফেলা যায় উদয়কে। খাবারের সঙ্গে একদিন বিষ মিশিয়ে দিল এক দাসী। বিষ খাবার খেয়ে উদয় মারা গেলেন।

উদয়মাণিক্যের পর রাজা হলেন তার ছেলে জয়মাণিক্য। কিন্তু সেনাপতি রণা জয়মাণিক্যকে পুতুল রাজা বানিয়ে নিজেই হলেন ত্রিপুরার হর্তাকর্তা বিধাতা। তাছাড়া তিনি সবসময় ভাবতে লাগলেন কি করে কবে জয়মাণিক্যকে সংসার থেকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে নিজে হবেন একচ্ছত্র অধিপতি। জয়ের চাইতেও ভয় জয়মাণিক্যের ভাই অমরমাণিক্যকে।

অমর তখন কলমীগড়ের সেনাপতি। হঠাৎ একদিন কলমীগড়ে অমরমাণিক্যের কাছে খবর এলো, তাঁকে যেতে হবে রাজধানীতে। রাজার আদেশ। অমর গড় ছেড়ে এলেন রাজধানীতে। তোরণের দরজায় পৌছতেই তাঁকে মালা পরিয়ে দেওয়া হল। প্রধান সেনাপতি রণা তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন ভূরি ভোজনের। অমর ছিলেন বড়ো বুদ্ধিমান। এতো রকমের আদর যত্নের বাড়াবাড়িতে সন্দেহ জাগলো তাঁর মনে। ভাবলেন, এর পেছনে অবশ্যই কোনো খারাপ মতলব আছে।

রণার বাড়িতে এলেন অমর, তুপুরের খাবার খেতে। আয়োজনের আর আপ্যায়নের বহর দেখে তাঁর সন্দেহ বেড়ে গেলো আরো। খাবার খেতে বসবেন অমর, হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা পুরনো এক পরিচিত বন্ধুর দিকে। আঙ্গুলের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি, "সাবধান অমর"। তিনি একটা পান হাতে নিয়ে পানের

বোঁটাটা ভাঙলেন মট করে। বুঝিয়ে দিলেন অমরমাণিক্যকে, "তোমার মুণ্ডটাও এমনি করে মটকাতে চায় উদয়মাণিক্য।"

ভোজন পর্বের সব আয়োজন শেষ। উদয়ও এসে উপস্থিত। এবারে খাবার পড়বে পাতে আর ঐ সঙ্গেই ঘাতক এসে দাঁড়াবে পেছনে, অমরের মাথা কেটে ফেলবে মাটিতে। খুব একটা কৌশল করলেন অমর। পাত থেকে হঠাৎ উঠে পড়লেন তিনি। বললেন, তাঁর এখনই যেতে হবে শৌচাগারে।

একজন লোক দেওয়া হল অমরের সঙ্গে। সে তাঁকে নিয়ে গেল শৌচাগারে। চারদিক তাকিয়ে দেখলেন অমর। কেউ নেই কাছে ধারে। শুধু সেই সঙ্গের লোকটা আছে দাঁড়িয়ে, বাইরে দূরে। তাকে চোখের আড়াল করলেন অমর। আর সেই সুযোগে দেওয়াল টপকে রণার বাড়ির বাইরে চলে এলেন তিনি। ঢুকলেন রণার ঘোড়াশালে। ভালো একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে পালিয়ে এলেন তিনি কলমীগড়ে। বাড়া ভাত পাতে পড়ে রইল। উদয়মাণিক্যের সব আয়োজন বিফল হয়ে গেল।

কলমীগড়ে ফিরেই অমর ডাকালেন সব সেনাদের। উদয়মাণিক্যের সকল সড়ের কথা জানালেন তিনি তাদের। আর জানালেন, তিনিই ত্রিপুরার সিংহাসনে বসবার একমাত্র অধিকারী। সেনারা সব শপথ নিল, অমরকেই রাজা করবে তারা। বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন অমরমাণিক্য। চলতে লাগলো যুদ্ধের উদ্যোগ।

এদিকে রণার কাছেও পৌঁছলো গিয়ে সব খবর। রণার ডান হাত তার ভাই সমরজিৎ নারায়ণ। রণা ভাবলেন, বিপদের দিনে ভাইকে একটা খবর দেয়া যাক। সমরজিতের কাছে দূত পাঠালেন রণা, দূতের হাতে রণার চিঠি।

অমরমাণিক্যের গুপ্তচর ফিরছে চারদিকে। তারা ধরে ফেললো রণার দূতকে। নিয়ে এলো তাকে অমরের কাছে। অমর দেখলেন এ এক মহা সুযোগ এসেছে আজ। দূতকে বন্দী করলেন তিনি।

এরপর একজন খুব বিশ্বাসী আর বুদ্ধিমান সেনানায়ককে পরালেন তিনি ঐ দূতের পোশাক। নতুন এই দূতকে পাঠালেন তিনি সমরজিতের কাছে। তার পোশাকের মাঝে লুকানো রইল ধারালো তলোয়ার।

সমরজিত তখন বসেছিলেন বাইরের ঘরে। কেউ নেই কাছাকাছি। দূত সহজে তার কাছে যেতে পারলো। রণার চিঠিখানা সে দিল সমরজিতের হাতে। কেউ কোনো সন্দেহ করেনি। কারণ রণার দূতেরই পোশাক পরেছে সে। খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন রণার চিঠিখানা সমরজিৎ।

এই তো সুযোগ। পোশাকের আড়াল থেকে ধীরে টেনে নিলো তলোয়ারখানা, দূতবেশী অমরের সেনাপতি। এক কোপে কেটে ফেললো সে সমরজিতের মাথা। রক্তগঙ্গা বইল ঘরের মেঝে জুড়ে। কেউ জানলো না কে কেমন করে মেরে ফেললো সমরজিতকে।

সমরজিতের কাটা মুণ্ডটা কৌশলে পাঠানো হলো রণার দুর্গে। রণার বুঝতে বাকী রইল না অমরমাণিক্যের কৌশলেই তার ভাই মরেছে।

আরো ভাবলেন তিনি, অমর নিশ্চয়ই সমরজিতের দুর্গ দখল করে নিয়েছে এতক্ষণে। ভাই মরে যাওয়াতে রণার ডান হাত ভেঙে গেল।

অমর-সেনারা এবারে বর্ষার মেঘের মতো হঠাৎ রণার দুর্গ চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। রণা দেখলেন, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আর। পালালেন তিনি প্রাণের ভয়ে। চারদিকে অমরের সেনার জাল, সবদিকে অমরের গুপ্তচরের সজাগ দৃষ্টি। কোথায় পালাবেন রণা। উপায় না দেখে ডুবে রইলেন এক জলাশয়ে। পরে ধরা পড়লেন অচিরে। অমরমাণিক্যের সেনারা তার প্রাণ নিয়ে নিল তখন।

জয়মাণিক্যও বুঝলেন, তাঁর দিনও ঘনিয়ে এসেছে। তিনিও পথ খুঁজলেন পালাবার। মল্লশালায় তার মৃত্যু হল। অমরমাণিক্যই হলেন ত্রিপুরার রাজা।

● মহারাজ অমরমাণিক্যের শ্রীহট্ট অভিযান

অমরমাণিক্যের চার ছেলে—রাজত্বর্লভ, রাজধর, অমরত্বর্লভ আর যুঝাসিংহ। চারজনই বীর।

দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরে অমরমাণিক্য প্রকাণ্ড এক দীঘি খনন করালেন। নাম দিলেন 'অমর সাগর'। এখনো উদয়পুরে আছে সে দীঘি। দেখতে একটা ছোটো খাটো হ্রদ বলে মনে হয়। মহারাজ অমরমাণিক্যের অমর কীর্তি এই 'অমর সাগর'।

ত্রিপুরার আশে পাশে জমিদার ছিলেন অনেক। তাঁরা সবাই প্রায় 'অমর সাগর' খননের কাজে লোক পাঠিয়েছিলেন উদয়পুরে। প্রায় এক লক্ষ লোক দিনরাত মাটি খুঁড়ে এ দীঘি তৈরী করেছে।

মহারাজ অমরমাণিক্য খবর নিয়ে জানলেন, একমাত্র শ্রীহট্টের জমিদার কোনো লোক পাঠাননি অমরসাগরের কাজে। তাঁর উপর অমর রেগে গেলেন। রাজার আদেশে পুত্র রাজধর বাইশ হাজার সেনা নিয়ে শ্রীহট্টের 'তরপের' দিকে এগিয়ে গেলেন। শ্রীহট্টের জমিদার ভয় পেয়ে আশ্রয় নিলেন পাঠান শাসনকর্তা ফতে খাঁর কাছে।

এবারে তাই পুরোপুরি একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হল সকলকে। রণভীম, গজঝম্প, বীরঝম্প, গজসিংহ, বীরবিক্রম এই সব বীর সেনাপতি যাবেন যুদ্ধ করতে। এর সঙ্গে চললো একদল বাঙ্গালী সেনাও। সেনাপতির নাম প্রতাপনারায়ণ।

ঢাল হাতে ঢালি চললো দু'হাজার। পায়ে তাদের নূপুর। রুনু ঝুনু বাজছে। সেনাপতি গরুড় গরুড়নারায়ণ পক্ষীর মতো করে সাজিয়ে নিলেন তার সেনাবাহিনী। একজন সেনাপতি হলেন পাখীর ঠোঁট, মাথা তৈরী হল দুজন সেনাপতি দিয়ে। একশ সেনা দিয়ে তৈরী হল

পাখীর গলা। পাখীর পেটে রইল সব চাইতে বেশী সেনা আর তার সঙ্গে রইল বহু হাতী ঘোড়া। সর্বদার জন্য পেটে রইলেন দু'জন সেনাপতি। দু'টি পা তৈরী হল দু'জন সেনাপতি দিয়ে। রাজকুমার রাজধর রইলেন মাঝে, পূর্ণিমার চাঁদের মতো। নৌকা পথে আরো সৈন্য চললো ইছা যাঁর সঙ্গে।

সুরমা নদীর উজান বয়ে নৌকোগুলো পৌঁছলো গিয়ে শ্রীহট্টে। প্রথমেই যুদ্ধ বাঁধলো ফতে খাঁ পাঠানের সঙ্গে। সুরমা নদী পার হয়ে সব সৈন্য পৌঁছলো গিয়ে 'গোধারানী' গ্রামে। সেখানে চললো মহা যুদ্ধ। শিক্ষিত হাতীগুলো শুঁড়ে জড়িয়ে আছড়ে মারছে সব পাঠান সেনাদের। সব চাইতে কঠিন যুদ্ধ করলো যে হাতী তার নাম 'বান্তাও'। তাকে চালিয়ে নিচ্ছে মহাবীর ঐরাজিৎ। পাঠানদের 'তুরাকী' ঘোড় সওয়ারেরা ঘিরে ধরলো বীর ঐরাজিৎ আর তার হাতীকে। অবিরাম তীর ছুঁড়ে বিঁধতে লাগলো তারা তাদের। তীরে তীরে দেহ ছেয়ে গেল ঐরাজিতের।

দুপুরে যুদ্ধ থামলো অল্প সময়ের জন্য। ঐরাজিৎ নেমে এলো হাতী থেকে। পিপাসায় বড়োই কাতর সে। জল পান করতে হবে তাকে। পাঠান সেনারা দূরে সরে দাঁড়ালো। জলপান করতে গেল ঐরাজিৎ। পাঠানরা অনুরোধ করলো, "তুমি এসো আমাদের দলে, অনেক ধনরত্ন পাবে তুমি।" মন টললো না ঐরাজিতের। দেশকে যে ঠিক ঠিক ভালোবাসে সে কখনো যেতে পারে দেশের বিপক্ষে ?

আবার খুব যুদ্ধ করলো ঐরাজিৎ আর তার হাতী। অনেক পাঠান সেনা মরলো তাদের হাতে। কুমার রাজধর পুরস্কার দিলেন ঐরাজিতকে।

এবারে পাঠানরাও হাতী নিয়ে যুদ্ধ করতে এলো। তাদের হাতীর নাম 'চলনা'। রাজধর এগিয়ে এলেন। চন্দ্রবাণ ছুঁড়তে লাগলেন তিনি। বাণ গিয়ে লাগলো পাঠানদের হাতী চলনার মাথায়। বিকট রকম চেঁচিয়ে, পড়লো সে হাতী পাঠান সেনাদের উপর। ভয়ে পালাতে লাগলো সব সেনা। রাজধরের জয় হল।

ফতে খাঁর সঙ্গে অন্য পাঠানেরা আশ্রয় চাইল কুমার রাজধরের কাছে। রাজধর ফতে খাঁকে বন্দী করে ইছা খাঁর সঙ্গে উদয়পুরে ফিরে এলেন। অমর পাঠান সেনাপতি ফতে খাঁকে খুব সম্মান দেখালেন। একটি হাতী, পাঁচটি ঘোড়া, এবং আরো অনেক জিনিস সঙ্গে দিয়ে বিদায় করলেন তিনি পাঠান ফতে খাঁকে।

● ফুলকোঁয়াড়ি ছড়ার ভূত

ডাঙ্গর ফার দুই ছেলে। রাজা ফা আর রত্ন ফা। রত্ন ফা-ই পরে হলেন রত্নমাণিক্য। রত্নমাণিক্যের আবার দুই ছেলে প্রতাপমাণিক্য আর মুকুটমাণিক্য। মুকুটমাণিক্যের ছেলে মহামাণিক্য। তাঁর ছেলে ধর্মমাণিক্যের বংশে অমরমাণিক্য, রাজধরমাণিক্য আর গগনফার নাতি কল্যাণমাণিক্য।

কল্যাণমাণিক্যের জন্ম কৈলাগড়ে। বাবার নাম কচু ফা আর মায়ের নাম 'হাম থারমা'। কচুফার ভালো নাম ছিল পুরন্দর।

ছোটোবেলায় কল্যাণমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করা হল, "তুমি কি খেতে চাও?" শিশু কল্যাণ বললেন, "কিছু দুধ পেলে খাই।" তাই তার আরেক নাম রাখা হল 'দুগ্ধমান'।

উদয়পুরে এলেন কল্যাণমাণিক্য। তাঁর বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

উদয়পুরের কাছেই 'ফুলকোঁয়াড়ি ছড়া'। তার তীরে দুটি প্রকাণ্ড বটগাছ। তাতে ভূতের বাসা। চার পাঁচটি মামদো ভূত দিনরাত সেই গাছ দুটিতে ওলট-পালট করে খেলা করে।

দুর্গাপুজোয় চণ্ডীপাঠ সেরে এক ব্রাহ্মণ ফিরছিলেন সেই গাছের তলা দিয়ে। হাতে ছিল তাঁর ছাগ মাংস। গাছের তলায় যেতেই ভূতেরা লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বামুন ঠাকুরকে বললো, "দাও আমাদের

হাতে হাতে একটু একটু মাংস, চেখে দেখি।" ব্রাহ্মণ খুব ভয় পেয়ে গেল। গৌড়্‌দেশের ব্রাহ্মণ, মাংসে তাঁর বড়োই লোভ। ভূতকে বললেন তিনি, "কোন্ সাহসে মাংস নিতে চাস তোরা, এ-তো মহারাজের ভাগ নিয়ে চলেছি আমি, প্রসাদী মাংসের।" ভূতেরা শুনে বললো, "রাজা উজীর মানিনে আমরা। তোমার হাতে চণ্ডী পুঁথিখানা রয়েছে, তাই, নয়তো কখন তোমার ঘাড় মটকে মাংস কেড়ে নিতাম।"

রাজা অমরমাণিক্যের ছোটো ছেলে ঝুঝারনারায়ণ সেই ভুতুড়ে গাছ ছুটির কাছে বাড়ি বানালেন। অমরমাণিক্য গিয়ে দেখলেন একদিন সে বাড়ি। বললেন, "খুব ভালো বাড়ি হয়েছে তোমার।" ঝুঝার বললেন, "কিন্তু ভূতের ভয় বড়ো। ঐ বটগাছ ছুটোতে বসে রয়েছে সব মামদো ভূত। ঐ পথে যারা যায় তাদের সবাইকে ওরা ভয় দেখায়। আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে, বিকট রকম মুখচোখ করে।"

অমর বললেন, "ভয় করলেই ভয়, নইলে কিসের ভয়। তুমি রাজার ছেলে, তোমাকে হতে হবে সাহসী, বীর। শোনো তবে তোমাকে এক গল্প বলি ভূতের।"

এই বলে মহারাজ তাঁর যৌবন দিনের এক ভূতের গপ্পো শোনালেন ঝুঝারনারায়ণকে। বললেন তিনি, "তখন ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে ছিলেন বিজয়মাণিক্য। আমার বয়স তখন কম। তবুও মনে আমার কোনো ভয় ভীতি নেই, বিষম সাহস নিয়ে চলাফেরা করি। যশপুর থেকে গোপগ্রামে আসছিলাম। পথ দিয়ে চলেছি। পাশের বটগাছ থেকে ভূতেরা এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। হরির নাম নিলাম মনে মনে। তবুও পথ ছাড়ে না তারা। কি আর করবো, তলোয়ার হাতে নিলাম। কেটে ছু'টুকরো করলাম ভূতদের। ধপাস ধপাস করে সব কটা ভূত মাটিতে পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম পড়ে রয়েছে এক একটা গলা কাটা কাক।

অমরমাণিক্য বললেন ঝুঝারকে, "গাছ ছুটো কেটে শেকড় তুলে ফেল।"

গাছ কাটা হল। পথিকেরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে লাগলো আবার। গাছের শেকড় তোলা হল খুঁড়ে। তাতে হল এক বিরাট গর্ত। ফুলকোঁয়াড়ির ছড়ার সাথে যোগ হয়ে গেল সেই গর্তের। স্রোত বইতে লাগলো। হাঁসের ডিম আর ফুল দিয়ে পুজো দেওয়া হল সেখানে। ভূতের উৎপাত আর রইল না।

কিন্তু যেদিন মহারাজ গাছ দুটো কাটবার আদেশ দিলেন সেদিন থেকেই তাঁর কান টন্‌টন্‌ করতে লাগলো। টন্‌টনে বেড়ে ধীরে ধীরে দেখা দিল কর্ণরোগ। রাজা মরেণ কি বাঁচেন এই অবস্থা। বড়ো বড়ো সব রাজবৈদ্য কতো রকমের ওষুধ দিচ্ছেন। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

এদিকে রাজধর রাজার অসুখের সংবাদ শুনতে পেয়ে ভাবলেন, বাবা তো মরতে বসেছেন, এবারে দেখি সিংহাসনে বসতে পারি কিনা। হাতী ঘোড়া হাতীয়ার নিয়ে সে এসে পৌঁছলো রাজধানীতে। ছোটো রাজকুমার ঝুঝার একথা জেনে গেল ভীষণ রেগে। বললো সে, "বাবা না মারা যেতেই দাদা সিংহাসন নিয়ে টানাটানি করতে চায়, এ কেমন কথা।" রাগ চেপে রাখতে না পেরে তলোয়ার খুললো সে। সামনেই বড়ো এক থাম, তাতেই ভীষণ জোরে আঘাত করলো সে। থামের অনেকটা কেটে গেল সে আঘাতে। আর হলো প্রচণ্ড শব্দ। রাজার কানেও গেল সে আওয়াজ আর সংবাদ।

খুব বেদনা পেলেন অমরমাণিক্য। অসুখ নিয়েই উঠে এসে বসলেন তিনি সিংহাসনে। রাজধর মাথা নত করে ফিরে গেলেন রাজধানী থেকে। অমরমাণিক্য ভাবলেন, "এ জীবনের আর মূল্য কি? পিতার বর্তমানেই সিংহাসনের লোভ করে পুত্র!"

এ সময় আরো এক বিপদ ঘটলো। শত্রুরা সব প্রচার করে দিল রাজ্য জুড়ে, রাজার অসুখ সারাতে হলে একশো পঁচিশটি শিশুকে নৌকোতে তুলে নিয়ে ডুবিয়ে মারতে হবে ফুলকোঁয়াড়ির ছড়াতে।

এরকম খবরে রাজ্যের সব মানুষ ভীষণ ভয় পেলো। মায়েরা সর্বদা

কাছে কাছে চোখে চোখে রাখছে ছোটো ছেলেমেয়েদের।

নতুন আরো এক ভয়ের কথা রটে গেল রাজ্যে। ভীষণ ভূমিকম্প হবে উদয়পুরে, সব হয়ে যাবে ওলট-পালট। রাজবাড়ীতে হবে বাঘের বাসা, বাঘে মানুষ ধরে খাবে। নরমাংসের ভোজ লাগাবে কুকুর শেয়ালে মিলে। তারপর জলে জলাকার হবে রাজধানী, ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে জল। মহাপ্রলয়ের পর আড়াইশ গরু আর মানুষ মাত্র রইবে বেঁচে। চৌত্রিশ বছর কোনো রাজা থাকবে না ত্রিপুরায়। রাজা যে হবে পরে, গোপনে আড়ালে থেকে বড়ো হবে সে।

কল্যাণমাণিক্যের মায়ের কাছেও পৌঁছলো এ রটনা। 'হাম থারমা' কল্যাণকে নিয়ে রাখলেন তাঁর নিজের ভাইয়ের কাছে 'গামারিয়া কিল্লাতে'।

এদিকে অমরমাণিক্য সুস্থ হয়ে উঠলেন। দান খয়রাত করলেন অনেক। নানা রকমের গুজব যারা রটিয়েছে তাদের ধরে আনলেন সবাইকে। দেশে শান্তি ফিরে এলো। প্রজাদের মনে কোনো আর ভীতি রইল না।

● রসাঙ্গের যুদ্ধ

অমরমাণিক্যের রাজত্বকালের বড়ো ঘটনা রসাঙ্গের যুদ্ধ। অমরমাণিক্য সেনাপতি নিযুক্ত করলেন রাজকুমার রাজধর আর অমরদুর্লভকে।

ত্রিপুরী সেনা সহজেই গিয়ে পৌঁছলো চাটগাঁয়ে। সেতু বেঁধে কর্ণফুলি নদী পার হয়ে গেল তারা কৌশলে। বিপদ বাধালো ফিরিঙ্গি সেনারা। মঘ সেনার সঙ্গে মিলে ত্রিপুরী সেনাদের ঘিরে ধরলো তারা। তাদের কাছে রসদ পৌঁছবার কোনো আর পথ রইল না।

রণে ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সেনাদল। পথে পথে মরলো অনেকে অনাহারে। যারা কর্ণফুলির এপারে পালিয়ে এলো তারা, পথেই পেলো

ডাল চাল। অনেকেই অনেকদিন পরে পেট পুরে খাবে বলে রান্না চাপালো। অনেকে অনাহারেই পালাবার পথে এগিয়ে গেল।

মঘ সেনারা এগিয়ে আসছিল পিছে পিছে। পথে যারা খাবার লোভে পিছিয়ে পড়লো তারাই মরলো তাদের হাতে। যারা দুটি কাঁচা চাল মুখে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তারাই প্রাণে বেঁচে গেল।

মঘরা এখনো এগিয়ে আসছে। রাতের আঁধারে, বনের গভীরে গা ঢাকা দিল ত্রিপুরী সেনা। মঘ সেনা এগিয়ে এলো অনেকটা। সুযোগ এলো আচম্‌কা একটা আঘাত হানবার। আড়াল থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর ত্রিপুর সেনাদল। অতর্কিত এই আক্রমণে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়লো তারা। প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগলো তারা চাটগাঁয়ের পথে। অমর দুর্লভ এবারে আরো দু'জন বীর সেনা সঙ্গে নিয়ে মঘদের পিছু নিলেন। তাঁদের হাতে অনেক মঘের মাথা কাটা গেল। ত্রিপুরীরাই জয়ী হল অবশেষে।

পরাজিত মঘরাজ এক দূত পাঠালেন রাজধরমাণিক্যের কাছে। জানালেন তিনি, "পরের বছর আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।" রাজধর পত্রখানা পাঠিয়ে দিলেন অমরমাণিক্যের কাছে। তিনি জানালেন রাজধরকে, "যদি পারো কিছু মঘ সেনা ধরে নিয়ে এসো। মা দুর্গার পুজোর বেশী দেরী নেই, ছাগ মোষের বদলে তাদেরই বলি দেব মায়ের কাছে।"

বিজয়ী ত্রিপুরী সেনা আর সেনাপতিরা ফিরে এলে অমরমাণিক্য আনন্দিত হলেন খুব। কিন্তু সে আনন্দ বেশীদিন আর রইল না। পরের বছর মঘ সেনারা আবার আক্রমণ করলো ত্রিপুরা।

রাজ্যে দেখা দিল নানা অলক্ষণ। কুকুর আর শেয়াল কাঁদছে দিনে রাতে, কাঁদছেন গ্রামের দেবতা। জগন্নাথ বলরামের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। নিত্য হতে লাগলো ভূমিকম্প আর রাতের আকাশ থেকে হল উল্কা বৃষ্টি।

মাঘ মাসে দেখা গেল এসব অমঙ্গল। ফাল্গুনে কলমীগড় থেকে

সংবাদ এলো, মঘরাজ সেকেন্দার শাহ নিজেই এবারে আসছেন যুদ্ধ করতে।

এবারেও কুমার রাজধরই হলেন সেনাপতি। সঙ্গে রইলেন ঝুঝার।

সুন্দর এক কৌশল করলেন সেকেন্দার শাহ। দূত পাঠালেন তিনি রাজধরের শিবিরে। দূতের কাছে পাঠালেন সুন্দর এক হাতীর দাঁতের মুকুট। দূতকে চুপি চুপি বলে দিলেন, কৌশলে জেনে আসবে ত্রিপুরী সেনার সংখ্যা কতো, দেখে আসবে তাদের যুদ্ধের কৌশল।"

মুকুট আর পত্র পেতে তিন ভাইই এগিয়ে এলেন—ঝুঝার, রাজধর আর অমরদুর্লভ। হাতীর দাঁতের এই সুন্দর মুকুট কে নেবে, এই নিয়েই বচসা লাগলো তিন ভাইয়ে। সেই সুযোগে মঘ দূত দেখে নিল সব ঘুরে ফিরে।

রাজকুমার ঝুঝার যখন দেখলেন মুকুট তাকে দেওয়া হল না, তখন রেগে দূতকে বললেন, "যা দূত, গিয়ে বল তোদের রাজাকে যুদ্ধে পাঠান মেরে এমন অনেক মুকুট জয় করে নেব আমি। শেয়ালের মতো মরবে আমার হাতে সব পাঠান সেনা।"

এ-কথা শুনে দূত চাটগাঁয়ের পথে চলে গেল তাড়াতাড়ি। সেকেন্দার শাহ এসব কথা শুনে রেগে গেলেন খুব। বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে বনপথে এগিয়ে এলেন তিনি একেবারে রাজধরের গড়ের কাছাকাছি। সমতল পথে এলেন না তিনি। সে পথে রয়েছে ত্রিপুরার ঘোড়ায় চড়া সেনার দল।

রাজকুমার ঝুঝার খবর পেয়েই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। কারো বারণ শুনতে রাজী নয় সে।

দাদা রাজধরের ঘোড়াটা চেয়ে নিল ঝুঝার। ঘোড়ার নাম 'বৃন্দাবন'। রাজধর নিলেন ঝুঝারের হাতী 'জয়মঙ্গল'। এক দাঁতের এই হাতীটা দেখতে ভারি সুন্দর। যুদ্ধের পোষাক 'আঙ্গাজিরা' আর 'হাজারমেথী' পরে নিলেন ঝুঝার। সোনার ঢাকনা পরলেন মাথায়। ঝুঝার যুদ্ধে

চললেন। পেছনে চললেন হাতীর পিঠে রাজধর আর ঘোড়ার পিঠে অমরদুর্লভ।

ভোর না হতেই ওঁরা এসে পৌঁছলেন পাঠানদের শিবিরের কাছে। প্রচণ্ড লড়াই লাগলো। প্রাণপণ করে এগিয়ে গেলেন ঝুঝার। মঘসেনা সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মঘদের ভয় হল এবার বুঝি গড় আক্রমণ হয়। গড়ের আড়াল থেকে বন্দুক ছুঁড়তে লাগলো তারা অবিরাম। গড়ে ছিল তাদের তিরিশ হাজার বন্দুক। গুলিতে গুলিতে আকাশ ছেয়ে গেল। একটি গুলি হঠাৎ এসে লাগলো 'জয়মঙ্গল' হাতীর মাথায়। হঠাৎ গুলি লেগে হাতীটা গেল একেবারে ক্ষেপে।

ঝুঝার সিং এবারে ঘোড়া ছেড়ে হাতীর পিঠে চাপতে চাইলেন। দাদা রাজধরকে বললেন তিনি, "তোমার হাতীতেই একসঙ্গে বসবো এসে আমি।"

রাজকুমার ঝুঝারের পোশাক ছিল সোনাদানা দিয়ে তৈরী, নানা রঙে রঙিন। গুলি খাওয়া হাতীটা নানা রঙের জমকালো চোখ ধাঁধানো পোশাক দেখে গেল আরো রেগে। হঠাৎ হাতীটা উঠলো লাফিয়ে। ঝুঝার হাতীর পিঠ থেকে পড়তে পড়তে হাতীর গলার দড়ি ধরে রয়ে গেলেন কোনোরকমে। তিনি তখন হাতীর গলায় ঝুলছেন। ক্ষেপা হাতী ঝুলন্ত কুমার ঝুঝারের বুকে মারলো এক লাথি। ছিট্‌কে পড়লেন ঝুঝার পথের মাঝে।

রাজধর ভাই বলে ডাকছিলেন চেঁচিয়ে। কিন্তু ক্ষেপা হাতীকে বশে আনতে পারলেন না তিনি কিছুতেই। ছুটে চললো হাতী রণে ভঙ্গ দিয়ে।

এদিকে পথের পাশেই ছিল মঘ সেনা। তারা বাগে পেয়ে রাজধরকে আঘাত করলো শেল দিয়ে। সে আঘাতে রাজধর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর পেট চিরে রক্ত ঝরতে লাগলো। ত্রিপুর সেনাও সব রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাতে লাগলো।

আহত হয়েও বেঁচে রইলেন রাজধর। দৈবই বাঁচিয়ে রাখলো

তাঁকে। কারণ তিনিই তো রাজা হবেন পরে ত্রিপুরার।

পথে পড়ে ছিল কুমার ঝুঝারের দেহটা। মঘ সেনারা তলোয়ারের এক কোপে কেটে নিল তার মাথা। ভাবলো তারা, সেকেন্দার শাহ খুশী হবেন খুব রাজপুত্রের মুণ্ড পেলে। কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টো। রাজপুত্রকে মেরে ফেলার জন্য তিনি মঘ সেনাদের বকলেন খুব। বিনীত ভাবে জানালেন ত্রিপুরার রাজাকে, তিনি হুকুম দেননি রাজপুত্রকে মেরে ফেলবার। যুদ্ধ আপাতত থামলো।

কিছুদিন পর অমরমাণিক্যকে পত্র দিলেন সেকেন্দার, "আদম শাহকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, কোনো বিবাদ থাকবে না আর আপনার সাথে।"

সেকেন্দারের সঙ্গে আদমের ছিল ঘোর বিবাদ। আদমকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মহারাজ অমরমাণিক্য। অমর সেকেন্দারের পত্র পেলেন। কিন্তু কাজ করতে পারলেন না তার কথা মতো। তিনি জানালেন সেকেন্দারকে, "আমি ক্ষত্রিয়, যে আমার শরণ নিয়েছে তাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম।"

দূত ফিরে গেল। জানলেন অমরমাণিক্যের মনের কথা।

● বাদশাহ সেলিম ও যশোধরমাণিক্য

অমরমাণিক্যের পর ত্রিপুরার রাজা হলেন রাজধরমাণিক্য। তাঁর সময় মঘ সেনারা উদয়পুর ছেড়ে চলে গেল। উদয়পুর আবার দখল করে নিলেন রাজধর।

রাজধরের পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে যশোধরমাণিক্য। যশোধর তাঁর ভালো ব্যবহারে পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, প্রজা, সৈন্য সবাইকেই আপন করে নিলেন। ভালো লোকদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন আর খারাপ লোকদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতেন। সবাই

সুখী তাঁর শাসনে। সবাই মুগ্ধ তাঁর মধুর ব্যবহারে। প্রজাদের দেখতেন তিনি নিজের ছেলের মতো।

মঘরাজ হোসেন শাহর সঙ্গেও তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক। মঘদের কোনো অত্যাচারও তাই আর রইল না।

প্রতিবেশী রাজ্যের সব রাজারাই মেনে নিলেন রাজধরকে। গোল বাঁধালেন শুধু 'ভুলুয়ার' রাজা। তিনি. মেনে নিলেন না রাজধরকে রাজা বলে।

রাজধর সেনাদের আদেশ দিলেন 'ভুলুয়া' জয় করে নিতে। ত্রিপুরার সেনারা অভিযান চালিয়ে জয় করে নিল 'ভুলুয়া'।

ভুলুয়া-রাজ তাই মানলেন শেষে রাজধরকে রাজা বলে। ত্রিপুরার কাছাকাছি অন্য রাজ্যের রাজারাও রাজধরকে দিলেন রাজার সম্মান। দানে, ধ্যানে, পুণ্যে কাটলো বেশ কিছুদিন।

এরপর নানা বিপদ ঘটলো ত্রিপুরার। আবার বিবাদ বাঁধলো রাজা হোসেন শাহর সঙ্গে। দিল্লীর নবাব 'সাহাসিলিম' চাইলেন ত্রিপুরার হাতী আর ঘোড়া সংগ্রহ করতে।

নবাব ফতেজঙ্গ চললেন যুদ্ধে। সঙ্গে তাঁর দু'জন ওমরাহ। সেনাপতি হলেন 'ইস্পিন্দার' আর 'নুরুল্যা'। সবাই ঢাকা এসে উপস্থিত হলেন। ফতেজঙ্গ ঢাকাতেই রইলেন। 'নুরুল্যা' আর 'ইস্পিন্দার' সেনা নিয়ে এগিয়ে চললেন ত্রিপুরার দিকে। একজন গেলেন মেহেরকুলের পথে আর অন্যজন কৈলাগড়ের পথে। যশোধর মাণিক্যের কাছে খবর পৌঁছলো।

দূত পাঠালেন যশোধর। জানতে চাইলেন, কেন ত্রিপুরা অভিযানে আসছেন তাঁরা। তাঁরা জানালেন দিল্লীর নবাবের ইচ্ছের কথা। যতো হাতী আর ঘোড়া রয়েছে ত্রিপুরায় সব পাঠাতে হবে দিল্লীতে, নয়তো করতে হবে যুদ্ধ। যশোধর জানালেন তাঁদের।

"হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখনে।
তোমরা চলিয়া যাও যথা ইচ্ছা মনে ॥"

সুতরাং যুদ্ধ বাঁধলো। শত্রু সেনার সঙ্গে ত্রিপুরী সেনারা পেরে উঠলো না। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো তারা। যশোধরের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলো গিয়ে। তিনি সবাইকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন গভীর বনে।

উদয়পুর লুঠ হয়ে গেল। তেমন কিছু পেল না শত্রুরা। যশোধর-মাণিক্যকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। নুরুল্যা রাজাকে খুঁজে বার করতে লোক পাঠালেন বনের গভীরে।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে। তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো সৈন্য নেই যে তিনি যুদ্ধ করবেন। পালিয়ে যাবারও উপায় নেই সহজে। কারণ সঙ্গে রয়েছেন মহারানী। মঘ সেনার হাতে বন্দী হলেন যশোধর মাণিক্য।

মহারাজকে কিছুদিন উদয়পুরেই বন্দী করে রাখলেন 'নুরুল্যা' আর 'ইস্পিন্দার মির্জা'। তারপর তাঁকে তাঁরা নিয়ে গেলেন ঢাকায় নবাব ফতেজঙ্গের কাছে। ফতেজঙ্গ মহারাজ আর মহারানীকে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীর বাদশাহের কাছে।

বাদশাহ সেলিম যশোধরকে রাজার মতো আদর যত্ন করলেন। বললেন তিনি, "মহারাজ, তুমি ফিরে যাও তোমার রাজ্যে আর পাঠিয়ে দাও আমাকে তোমার রাজ্যের সব হাতী আর ঘোড়া।"

যশোধরমাণিক্য বললেন, "কোনো ধন রত্ন হাতী ঘোড়াই তো এখন আমার নেই আর। সবই তো লুটে নিয়েছে আপনার সেনারা। আমি পরাজিত। আমি আর পরাজয়ের অপমান নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবো না। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি রানীকে নিয়ে তীর্থ যাত্রায় যাই।"

বাদশাহ সেলিমের অনুমতি পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মহারাজ যশোধর প্রথমে এলেন বারাণসী ধামে। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করলেন সবাই। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন দেবদেবীকে।

গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী নদী এসে মিলেছে প্রয়াগ তীর্থে। সেখানে

গেলেন মহারাজ যশোধর। পরে এলেন তাঁরা মথুরায় আর বৃন্দাবনে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র এই মথুরা আর বৃন্দাবন। বহুদিন কাটালেন এখানে যশোধরমাণিক্য।

মহারাজের বয়স হল বাহাত্তর বছর। শরীরটা পুরানো হলো অনেক দিনের। নানা রকমের অসুখে ভুগতে লাগলেন তিনি। অবশেষে তাঁর দেহ রইল না আর। কৃষ্ণচরণ শরণ নিলেন মহারাজ যশোধর-মাণিক্য, পবিত্র বৃন্দাবনধামে।

● কল্যাণমাণিক্যের কথা

ত্রিপুরা তখনো অরাজক। ভিন্‌দেশী সেনারা ত্রিপুরার শহর গ্রাম লুটছে তখনো। প্রজারা সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে বনে বনান্তরে।

মঘ সেনাদের মধ্যে হঠাৎ এক রোগ দেখা দিল। একে একে সব সেনা মরতে লাগলো সেই বুনো রোগে। প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগলো তারা। উদয়পুরে তারা আর কেউ রইল না। শত্রুশূন্য হল উদয়পুর। এ সুযোগে ত্রিপুরার মন্ত্রী সেনা সেনাপতি আর প্রজারা সবাই আবার ফিরে এলো উদয়পুরে। কিন্তু রাজা ছাড়া কোনো শোভা নেই রাজ্যের, শান্তি নেই কোনোই। রাজা চাই দেশের একজন।

কে রাজা হবে তবে ত্রিপুরার? কে আছে রাজবংশের প্রদীপ জ্বালতে? যশোধরমাণিক্য তো ফিরে আসবেন না আর কোনোদিন।

সেনাপতি আর মন্ত্রীরা ভাবছেন খুব। শেষে তাঁদের মনে পড়লো কল্যাণমাণিক্যের কথা। মহামাণিক্যের বংশে তাঁর জন্ম। কৈলাগড়ে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে যশোধরমাণিক্য। অনেক যুদ্ধও চালিয়েছিলেন তিনি। তবে তাঁকেই করা হোক ত্রিপুরার রাজা।

সেনাপতি কল্যাণমাণিক্যই বসলেন সিংহাসনে। বহুদিন পরে আবার ত্রিপুরায় উৎসব আনন্দ হল। আবার চৌদ্দ দেবতার পুজো

হলো ত্রিপুরায়, বহুকাল পরে।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যকে স্বপ্নে জানালেন ত্রিপুরাসুন্দরী, তাঁর বড়োই জলের কষ্ট, রাজা যেন দীঘি তৈরী করে দেন!

উদয়পুরের মা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের পাশেই খনন করা হল এক বিশাল দীঘি। নাম হল তার 'কল্যাণসাগর'। বিশেষ পুজোর পর দীঘি উৎসর্গ করা হল মাকে।

মঘদের আক্রমণে ভেঙে গিয়েছিল মন্দিরের চুড়ো। ভাঙা চুড়ো নোতুন করে গড়ে দিলেন মহারাজ কল্যাণমাণিক্য।

ত্রিপুরার সব দীঘি জলশূন্য করেছিল মঘেরা। তাদের ধারণা ছিল, দীঘির তলায় লুকানো আছে অনেক ধন রত্ন। জলশূন্য সেই দীঘি-গুলোকে আবার জলে পূর্ণ করে তুললেন মহারাজ কল্যাণমাণিক্য। আরো অনেক মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

ত্রিপুরার অনেক রাজাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তুলাপুরুষ দান করে। বড়ো একটা দাঁড়ি পাল্লার একদিকে বসেন মহারাজ আর অন্য দিকে তুলে দেওয়া হয় সোনা দানা টাকা কড়ি। রাজার দেহের ওজনের সমান এই ধন রত্ন সবই দান করা হয় ব্রাহ্মণকে। কল্যাণ মাণিক্যও সে দান করলেন।

সাঁইত্রিশ বছর ধরে রাজা ছিলেন কল্যাণমাণিক্য। তারপর তিনি মারা গেলেন।

● রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্য

কল্যাণমাণিক্যের পর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে গোবিন্দমাণিক্য। তাঁকে বলা হ'ত রাজর্ষি। মনটা ছিল তাঁর মুনি ঋষিদের মতো পবিত্র।

গোবিন্দমাণিক্যের জীবন নিয়ে দুখানা বই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'রাজর্ষি' আর 'বিসর্জন'। ঠিক ঘটনার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন

তাঁর মনের কল্পনা, দুটি বইতেই। বড়ো লেখকরা এমনি করেই লেখেন। সত্যিকার ঘটনা থেকে তাঁদের ভাবনাটাই আরো সত্য বলে মনে হয়।

মা ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের কাছেই গোমতী নদী। গোবিন্দমাণিক্য রোজ স্নান করতেন সেখানে। পাথরে বাঁধানো নদীর ঘাট। ঝর্নার মতো সুখে বয়ে চলেছে গোমতী। বনে ঘেরা নদীর এপার ওপার, পথ ঘাট, মন্দিরের উঠান। পাখীর গান ভোরের মিঠে রোদে মিশে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে আর বাতাসে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে সেদিন নদীর ঘাটে দেখা হল দুটি ছেলে মেয়ের। নাম তাদের হাসি আর তাতা। রাজধানী থেকে কিছু দূরে তাদের ঘর। তারা বড়ো গরীব। মা বাবা নেই তাদের। থাকে তারা কাকা কেদারেশ্বরের কাছে। রাজাকে তারা রাজা বলে জানে না, জানে খেলার সাথী বলে। রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাদের। পুজোর ফুল তুলে দেন তিনি হাসি আর তাতাকে।

আষাঢ় মাসের আকাশঢাকা মেঘের এক দিন। বৃষ্টি নেই, মেঘে মেঘে বনপর্বত আঁধার করে রয়েছে। হাসি এসেছে, তাতাও এসেছে। রাজাও এসে পৌঁছলেন গোমতীর ঘাটে।

কাল রাতে শত শত মোষ বলি হয়েছে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনে। রক্তের একটি রেখা মিশেছে মন্দির থেকে গোমতীর জলে।

হাসি প্রশ্ন করলো মহারাজকে, "এতো রক্ত কেন?" হাসির প্রশ্নটা মহারাজের মনে বেহালার করুণ রাগিণী বাজিয়ে দিল। ভাবছেন তিনি, আনন্দময়ী মায়ের পুজোয় রক্তের কি প্রয়োজন।

পরদিন ভোর হল আবার। রোজই ভোর হয়। ভোর হওয়াকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু সব ভোর সবার কাছে সমান হয়ে আসে না, কারো দুঃখের রাত ভোর হয়, কারো সুখের।

রাজা গেলেন গোমতীর সেই ঘাটে। তাতা এসেছে, হাসি আসেনি সেদিন। হাসি আসেনি কেন? হাসির মনের অসুখ সারা শরীরে ছড়িয়েছে, তার খুব জ্বর। হাসির শিশুমনে বেদনা আর ভয় হয়েছিল

খুব, গতকাল রক্তের কথা শুনে। সে শুনেছিল, একশ মোষ বলি দেওয়া হয়েছে আর তারই রক্তের ধারা পড়েছে গিয়ে গোমতীর জলে।

রাজা তাতার সঙ্গে গেলেন হাসিকে দেখতে। সারারাত কাটলো সেখানে মহারাজের। তবুও বাঁচলো না হাসি। তাতা একা হয়ে গেল। রাজার ভালোবাসা এবারে সবটা গিয়ে পড়লো তাতার উপর।

রাজার মনে আঘাত লাগলো হাসি মারা যাবার পর। বলিদান বন্ধ করে দিলেন তিনি। রাজার উপর রেগে গেলেন মন্দিরের পূজারী ঠাকুর রঘুপতি।

ব্রাহ্মণেরা বরাবরই মনে করতেন, ভগবানের সঙ্গে তাঁদেরই যোগাযোগ বেশী। এতোদিনের বলিদানের রেওয়াজটা বন্ধ হবে রাজার আদেশে? রাজা কে? সে কি মায়ের সেবকের চাইতেও বড়ো? রঘুপতি মনে মনে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ব্রাহ্মণে আর রাজায় বিবাদ বাঁধলো।

রঘুপতি ডাকলেন রাজার ছোটো ভাই নক্ষত্র রায়কে। তাঁর ভালো নাম ছত্রমাণিক্য। বললেন তাঁকে, "তুমিই এরপর রাজা হবে এ-দেশের, মায়ের বলি বন্ধ করে কেউ রাজা হয়ে থাকতে পারে না। মা খুব রেগে গেছেন এবং সেকথা জানিয়েছেন আমাকে। তিনি চান গোবিন্দ-মাণিক্যের রক্ত। সে রক্ত তুমিই এনে দাও। মাকে খুশী করো, রাজা হবে।"

নক্ষত্র রঘুপতিকে খুব ভয় করতেন। তিনি রাজী হয়ে গেলেন তাঁর কথায়। কিন্তু কি করে ভাইয়ের বুকে আঘাত করবেন তিনি?

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য জানলেন ব্যাপারটা। একদিন তিনি নক্ষত্র রায়কে ডেকে নিয়ে গেলেন গভীর বনে। হাতে তুলে দিলেন ধারালো তলোয়ার। বললেন তিনি, "সব মানুষের সামনে ভাই ভাইয়ের বুকে ছোরা মারবে, এটা উচিত নয়। এখানে কেউ নেই, তুমি আমার বুকে আঘাত করো।"

আরো বললেন গোবিন্দমাণিক্য, "তুমি সিংহাসনের লোভে আমাকে

মারতে চাও। কিন্তু জেনে রেখো, রাজাকে বধ করে রাজ্য পাওয়া যায় না। রাজ্য পেতে হলে দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে। হাজার হাজার মানুষের দুঃখকে, অভাবকে নিজের দুঃখ অভাব বলে ভাবতে হবে। সবাইকে সুখী করতে চেষ্টা করতে হবে। রাজা হওয়া সহজ নয়।"

নক্ষত্র গোবিন্দমাণিক্যের ভালোবাসার কাছে পরাজিত হলেন। রঘুপতি হারালেন নক্ষত্রকে। হৃদয়ের কাছে বুদ্ধি পরাজিত হল।

রঘুপতি দমলেন না। এবারে তিনি রাজরক্ত আনতে আদেশ করলেন তাঁর আপনজন জয়সিংহকে। জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, রাজবংশের ছেলে সে। রঘুপতি তাকে ছোটোবেলা থেকেই পালন করেছেন নিজের ছেলের মতো। তাকে তিনি শুনিয়েছেন ধর্মের কথা, শিখিয়েছেন মায়ের পুজোর কাজ।

রঘুপতি জয়সিংহকে রাজরক্ত আনতে বললেন। জয়সিংহ ভাবছে, সত্যই কি মা রাজরক্ত চান ? মায়েরা কি ছেলেমেয়ের রক্ত পান করতে পারেন কখনো ?

সন্দেহের মন নিয়ে মায়ের মূর্তির সামনে এগিয়ে গেল জয়সিংহ। মাকে ডেকে বললো, "তুই কি মা হয়ে ছেলের রক্ত চাস মা ?" মূর্তির আড়াল থেকে রঘুপতি বললেন, "চাই আমার রাজরক্ত"। শুনে চমকে উঠলো জয়সিংহ। করুণাময়ী মা নিজে চাইছেন সন্তানের রক্ত পান করতে। গুরুর আদেশ পালন করবেন জয়সিংহ। এনে দেবেন মাকে রাজরক্ত।

জয়সিংহও একদিন তলোয়ার হাতে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে উপস্থিত হল। তাতার সঙ্গে ছিলেন তখন গোবিন্দমাণিক্য। তাতা এখন থাকে মহারাজের কাছেই। তিনি তার নতুন নাম দিয়েছেন ধ্রুব। মহারাজের পবিত্র হৃদয়ের সঙ্গে ধ্রুবের সরল শিশুমনের সহজ মিলন হয়েছে।

ধ্রুব আর গোবিন্দমাণিক্যের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো জয়সিংহ, "মায়ের আদেশ পেয়েছি আমি, মা রাজরক্ত চান।"

মহারাজ বললেন, "মা কি কখনো ছেলের রক্ত চাইতে পারেন? ভুল শুনেছ তুমি। তোমার গুরুই তোমাকে বলেছেন এমন কথা, মূর্তির আড়াল থেকে।"

তবুও জয়সিংহের হাতে তলোয়ার, তবুও বললে সে, "গুরুর আদেশই হোক অথবা মায়েরই হোক সে আদেশ, রাজরক্ত চাই আমি।"

ধ্রুব ভয় পেয়ে রাজার বুকে গিয়ে লুকালো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন গোবিন্দমাণিক্য। এমন একটা ভালোবাসার পরিবেশে জয়সিংহের হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়লো। রাজাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল সে। ভালোবাসাই জয়ী হল, হিংসা নয়।

রঘুপতি রয়েছেন অটল। তিনি জয়সিংহকে ছাড়লেন না। মায়ের মন্দিরে নিয়ে গেলেন তাকে। মায়ের সামনে শপথ করালেন, রাজরক্ত এনে দেবে সে।

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিনি। আজ রাতে চৌদ্দ দেবতার পুজো। আকাশে মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা। আলো-আঁধারী থম্‌থমে ভাব সকল চরাচরে। পুজোর রাতে পথ ঘাট জনহীন। কারো বাইরে আসা নিষেধ আজ।

জয়সিংহ একলা বসে নদীতীরে। তাঁর হাতে একটি ছুরি। পাথরে ঘষে ঘষে ছুরিটাকে ধারালো করছে সে।

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল গোটা আকাশ। বৃষ্টি নেমে এলো মুষলধারে। জয়সিংহ ধীরে ধীরে উঠে এলেন, নদীর ঘাট থেকে মায়ের মন্দিরের পথে। তার সারা শরীর ঢাকা একখানা সাদা কাপড়ে।

মন্দিরে হাজার দীপের আলো। তারই মাঝে জিভ মেলে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকালী। একপাশে পড়ে রয়েছে বলি দেবার খাঁড়াটা।

পুজোর সময় এগিয়ে এলো। রাত দু'প্রহর। বৃষ্টি ভেজা শরীরে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো জয়সিংহ। রঘুপতি তাকে দেখে আনন্দিত। জয়সিংহ তাহলে প্রতিজ্ঞা পালন করেছে, এনেছে রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের রক্ত। বললেন তিনি, "রাজরক্ত এনেছ বৎস?" জয়সিংহ

জানালো, "এনেছি, আমি নিজেই মাকে নিবেদন করবো সে রক্ত।"

মায়ের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো জয়সিংহ। শেষ বারের মতো মাকে বললো সে, "সত্যই কি তুই রাজরক্ত চাস মা? দেব আমি রাজরক্ত। আমি রাজপুত, আমার রক্তই রাজরক্ত।" এই বলে সে ধারালো ছোরাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল নিজের বুকে। রক্তে রাঙ্গা হল তার বসন। ধীরে ধীরে জয়সিংহের দেহটা লুটিয়ে পড়লো মায়ের সামনে। তার সেই শেষ কথাটা, "আমার রক্তই রাজরক্ত" শুধুই যেন ধ্বনিত হতে লাগলো বার বার, আর সেই শব্দ ধীরে মিশে গেল বাদল রাতের পাগল বাতাসে, বনে বনান্তরে, জ্যোৎস্নায় আকাশে, সব জায়গায়।

রঘুপতির মনে এবারে লাগলো এক আঘাত। তাঁর আদরের জয়সিংহ তাঁরই জন্য প্রাণে বেঁচে রইল না আর। সারারাত জয়সিংহের নীরব দেহটা ধরে পড়ে রইলেন রঘুপতি। আর কোনো দিন সে ডাকবে না তাকে পিতা বলে, গুরুদেব বলে। এবারে বুঝি রঘুপতি বুঝলেন প্রাণের মূল্য কতো।

যে আঘাত পেয়েছেন রঘুপতি তা তিনি ফিরিয়ে দিতে চাইলেন গোবিন্দমাণিক্যকেই। জানতেন তিনি, ধ্রুব গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের সমান। নক্ষত্রের সাহায্যে সেই ধ্রুবকেই তিনি ধরে নিয়ে এলেন মায়ের মন্দিরে। ধ্রুবের রক্তে রাঙ্গিয়ে দেবেন মায়ের চরণ, রাজা বুঝবে তখন ছেলে হারাবার বেদনা।

ধ্রুবকে নক্ষত্র রায় তুলে দিলেন রঘুপতির হাতে। ভয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো বালক ধ্রুব। কাতর ধ্রুব বলির পশুর মতো পড়ে রইল এক পাশে। তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখলো সে তার মাকে, তার দিদি হাসিকে।

স্বপ্নে শিশুর কান্না শুনে জেগে উঠলেন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য। শুনতে পেলেন কেদারেশ্বরের কথা। ধ্রুবর কাকা সে। ধ্রুব ঘরে ফেরেনি আজ। কোথায় তবে ধ্রুব? কেদারেশ্বরের ব্যথা রাজার মনে বেদনা জাগালো। প্রহরীদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ধ্রুবের সন্ধানে।

মায়ের মন্দিরে গেলেন মহারাজ। বলির আয়োজন তখন প্রায় শেষ। ধ্রুব তখনো ঘুমিয়ে পড়ে আছে মন্দিরের কোণে। কেদারেশ্বরের হাতে তুলে দিলেন তিনি ধ্রুবকে। রঘুপতি আর নক্ষত্র বন্দী হলেন।

পরদিন বসলো বিচার সভা। রাজার আদেশ হল, আজই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে নক্ষত্র আর রঘুপতিকে। রাজ্যের সেনারা তাঁদের রাজ্যছাড়া করে দিয়ে আসবে।

রঘুপতি বললেন রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে, "সকলের সামনে তোমারও বিচার করছি আমি। তুমি নিয়ম না মেনে চৌদ্দ দেবতার পুজোর রাতে বাইরে বেরিয়েছিলে। তোমাকে আমি জরিমানা করছি ত্বলক্ষ টাকা। মায়ের পূজক হিসেবে এ টাকা আমিই পাবো।"

রাজা মেনে নিলেন সে বিচার। রাজার আদেশে রঘুপতির হাতে দেওয়া হল ত্ব'লক্ষ টাকা তুলে।

ত্রিপুরা ছেড়ে রাজমহলে গিয়ে পৌঁছলেন রঘুপতি। সেখানে রয়েছে মুঘল সেনারা। বাংলার নবাব তখন বাদশাহ শাহজাহানের ছেলে সুজা।

রঘুপতি ভাবলেন, সুজার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। জানলেন, রাজমহল ছেড়ে সুজা চলে গিয়েছেন বিজয়গড়ে। রঘুপতিও চললেন বিজয়গড়ের দিকেই।

সামনেই জনহীন বড়ো এক মাঠ। সেই মাঠেরই এক জায়গায় রঘুপতি পুঁতে রাখলেন টাকাকড়ি গুলো। এগিয়ে চলেছেন রঘুপতি। পথের ত্ব'ধারে মরা মানুষের শরীর পড়ে রয়েছে। মাঠের কাঁচা ধান কেটে নিয়ে গেছে মুঘল সেনারা, হাতী ঘোড়াকে খাওয়াবে বলে। অবিচারের চিহ্ন সব জায়গায়। দেশে ত্বর্ভিক্ষ লাগিয়েছে ওরা।

পথ চলতে চলতে রাত হল। অন্ধকার ছুটে আসছে চার দিক থেকে, আলো মুছে দেবে বলে। সামনেই গাছের ছায়ায় দেখতে পেলেন রঘুপতি এক দেবমন্দির। ওখানেই রাত কাটালেন রঘুপতি। ভোরে জেগে দেখলেন, রাতের অন্ধকারে, একটা মরা মানুষের শরীরকেই

বালিশ করে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি।

আবার পথ চলছেন রঘুপতি প্রভাত বেলায়। মুঘল সেনাদের হাতে পড়লেন তিনি। তারা নানা ভাবে অপমান করলো তাকে আর অবশেষে নিয়ে গেল শাহ সুজার-সামনে। সুজা কিন্তু কোনো খাতির করলেন না তাঁকে।

সেনাদের হাত এড়িয়ে রঘুপতি পৌঁছলেন এসে বিজয়গড়ে। সেখানে ব্রাহ্মণ রঘুপতির বড়োই সমাদর হল। ঐ গড়েই রয়ে গেলেন রঘুপতি। ধীরে ধীরে গড়ের সকল দিক ভালো করে দেখে নিলেন তিনি। জেনে নিলেন কোন্ গোপন পথে পালাতে হয় গড় থেকে।

বিজগড়ে রয়েছেন বিক্রমসিংহ। সুজার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধালো। যুদ্ধে সুজা পরাজিত আর বন্দী হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল বিজয় গড়ে। রঘুপতি তখনো ছিলেন বিজয়গড়েই। এক রাতে গোপন পথে সুজাকে উদ্ধার করলেন তিনি বন্দী দশা থেকে।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে 'গুজুর পাড়া' গ্রাম। সেখানে আছে ত্রিপুরার রাজাদের পুরানো এক প্রাসাদ। নক্ষত্র রায় রাজ্য ছেড়ে রয়েছেন এখানে এসে। গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে ভালোই দিন কাটছে তাঁর।

খবর করতে করতে রঘুপতিও এসে পৌঁছলেন সেই গ্রামে। নক্ষত্রকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন তিনি সুজার রাজধানীর দিকে। যাবার পথে মাটিতে পোঁতা দু'লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। টাকাটা দিলেন এনে সুজাকে। টাকা পেয়ে সুজা খুব খুশী। কারণ তখন তাঁর টাকার বড়ো প্রয়োজন। আবার যুদ্ধ করতে হবে তাঁকে।

এবারে আসল কথা পাড়লেন রঘুপতি। তিনি সুজাকে জানালেন, "গোবিন্দমাণিক্যকে তাড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্রকে করে দিতে হবে ত্রিপুরার রাজা।" সুজা সব রকমের সাহায্য করতে রাজী হলেন রঘুপতিকে। কিছু নবাবী সেনা নিয়ে রঘুপতি আর নক্ষত্র চললেন ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে।

এদিকে সব সংবাদ পেলেন গোবিন্দমাণিক্য। তিনি সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নারাজ। রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেলেন

তিনি। কিছুদিন কাটালেন রিয়াং প্রজাদের অতিথি হয়ে। তার পর তিনি চলে গেলেন চাটগাঁয়ের পর্বতে, আরাকানে। আরাকানের রাজা আশ্রয় দিলেন তাঁকে। সেইখানেই রইলেন গোবিন্দমাণিক্য।

তখন দিল্লীর মসনদে রয়েছেন ঔরঙ্গজেব। তাঁর ভয়ে অন্য সবাই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুজা পালিয়ে এসেছেন আরাকানে।

আরাকান রাজসভায় সুজা গেলেন একদিন। তখন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আর আরাকানরাজ বসে কথা বলছিলেন। গোবিন্দ-মাণিক্য আসন ছেড়ে উঠে সম্মান জানালেন সুজাকে। রাজা রাজার সম্মান রাখলেন। কিন্তু সুজাকে অতটা মান দেওয়া মোটেই ভালো লাগলো না আরাকান রাজের।

দরবারের বাইরে আবার দেখা হল সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের। সুজা খুব খুশী হয়েছিলেন মহারাজের ব্যবহারে। নিজের হাত থেকে অনেক দামী এক হীরার আংটি নিয়ে তা তিনি পরিয়ে দিলেন গোবিন্দ-মাণিক্যের হাতে। গোবিন্দমাণিক্যও গ্রহণ করলেন সেই ভালোবাসার দান।

সাতটি বছর কেটে গেল এ-ভাবে। নক্ষত্র রাজা হলেন ত্রিপুরার। সিংহাসনে বসেও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়লো তাঁর দাদার কথা। কিন্তু সে বেদনা মনে রাখতে হ'ত তাঁকে।

মন ভালো না থাকলেই নানা রকম রোগ এসে বাসা বাঁধে শরীরে। ছত্রমাণিক্যেরও তাই হ'ল। পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে গেল তাঁর।

নক্ষত্রের মরণের সংবাদ পৌঁছলো গিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে। চোখের জলে ভেসে তিনি ফিরে এলেন ত্রিপুরায়। নতুন রাজাকে বরণ করে নিলো ত্রিপুরাবাসী। আনন্দের বান বয়ে গেল। গোবিন্দমাণিক্য আবার বসলেন ত্রিপুরার সিংহাসনে।

এবারে এক পত্র এলো দিল্লী থেকে। ঔরঙ্গজেব জানিয়েছেন গোবিন্দমাণিক্যকে, সুজাকে খুঁজে বার করে তুলে দিতে হবে তাঁর হাতে ; আর চাই ত্রিপুরার হাতী।

সুজার খবর না দিতে পারলেও প্রতি বছর ত্রিপুরা থেকে হাতী পাঠাবেন বলে জানালেন গোবিন্দমাণিক্য ঔরঙ্গজেবকে। শান্ত হলেন দিল্লীর বাদশাহ।

সুজার দেওয়া হীরার আংটিটা বিক্রি করে অনেক টাকা পেলেন গোবিন্দমাণিক্য। সে টাকা খরচ করে তিনি এক মসজিদ গড়লেন গোমতী নদীর তীরে। নাম দিলেন 'সুজা মসজিদ'। আজও সে মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে গোমতীর তীরে, জানিয়ে দিচ্ছে গোবিন্দমাণিক্য আর সুজার ভালোবাসার কথা।

● রামমাণিক্যের মহানুভবতা

গোবিন্দমাণিক্যের পর রাজা হলেন রামমাণিক্য। রামমাণিক্যের ছেলের নাম চন্দ্র সিংহ। রূপে গুণে ঠিক যেন দেবতা। মনের আনন্দ তাঁর এই নন্দন।

সরাইলের জমিদার নূরমহম্মদ। তাঁর ছেলের নাম নাদির মহম্মদ। একদিন নাদির বলে বেরিয়েছেন পশু শিকার করতে। আর ঠিক সেদিনই হরিণ শিকারে বেরিয়েছেন রাজকুমার চন্দ্র সিংহ। দু'জনে এগিয়েছেন বনের দু'দিক থেকে।

সামনেই একদল হরিণ দেখতে পেলেন চন্দ্র সিংহ। সাবধানে এগিয়ে চললেন তিনি। নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন বনের আড়ালে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে গুলি ছুঁড়বেন তিনি হরিণের দলের উপর। একসঙ্গে মরবে অনেক হরিণ।

নাদির মহম্মদও দেখতে পেয়েছেন এই হরিণের দল, ভিন্ন প্রান্ত থেকে। তিনিও এগিয়ে আসছেন আরো কাছাকাছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন নাদির। ঐ তো সামনে কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে কি একটা নড়ে উঠলো। এ তো হরিণ নয়, বুনো হাতী অথবা গণ্ডার।

প্রাণ নিয়ে পালানোও সহজ হবে না। যুদ্ধ অথবা মৃত্যু। নাদির দূর থেকে ঐ ঝোপ লক্ষ্য করে তুবার বন্দুক ছুঁড়লেন। মানুষের গলার আর্ত চিৎকার ভেসে এলো ঝোপের আড়াল থেকে। তবে কি মানুষ ছিল লুকিয়ে ঐ ঝোপের আড়ালে? ছুটে গেলেন নাদির সেই দিকে।

ওখানে ছিলেন কুমার চন্দ্র সিংহ। তিনি দেখতে পাননি নাদির মহম্মদকে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐ হরিণের দল। তাঁরই বুকে লেগেছে বন্দুকের গুলি।

নাদির কেঁদে আকুল হলেন সুন্দর এই রাজকুমারকে দেখে। বাঁচবার কোন আশা নেই তার। তুটো গুলিই বিঁধেছে বুকে। ছুটে চলে এলেন নিজের শিবিরে নাদির মহম্মদ। ভাবতে লাগলেন তিনি, জীবনে এতো বড়ো অপরাধ আর কোনো দিন করেন নি।

চন্দ্র সিংহের সহচরেরা ছুটে এলেন সবাই। ততক্ষণে তার দেহে প্রাণ নেই আর। রাজকুমারের মৃতদেহ পৌঁছলো গিয়ে রাজধানীতে। শোকে আকুল হলেন রাজা রানী, শোকের ছায়া নামলো রাজ্য জুড়ে।

রামমাণিক্য জানলেন, তাঁর ছেলের মৃত্যুর কারণ নূর মহম্মদের ছেলে নাদির মহম্মদ। নূর মহম্মদও জানতে পারলেন, তাঁর ছেলের হাতেই মৃত্যু হয়েছে রাজকুমার চন্দ্র সিংহের।

নূর মহম্মদ ভাবলেন, আমার ছেলেরই অপরাধ। তার সাজা হওয়া দরকার। তাছাড়া মহারাজ রামমাণিক্যের মনে আদরের ধন চন্দ্র সিংহের অভাবে যে তুঃখের বোঝা জমেছে তাও হালকা হওয়া প্রয়োজন। তিনি লোক লস্কর সঙ্গে দিয়ে নাদিরকে পাঠিয়ে দিলেন ত্রিপুরার রাজ দরবারে।

শোকে তুঃখে অভিভূত হয়ে রাজ দরবারে বসে রয়েছেন মহারাজ রামমাণিক্য। নাদির মহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে নূর মহম্মদের লোক রাজ দরবারে এসে দাঁড়ালো অভিবাদন করে। তারা একখানা পত্র দিল মহারাজ রামমাণিক্যের হাতে। তাতে লেখা রয়েছে, "মহারাজ, আপনার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমার পুত্র নাদিরই সম্পূর্ণ দায়ী। আমি নাদিরকে

পাঠালাম আপনার দরবারে। আপনি তার যথাবিধি শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

পত্রখানা বার বার পড়লেন রামমাণিক্য। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চোখের কোণ দিয়ে। মহারাজ মুগ্ধ হলেন নূর মহম্মদের মহানুভবতায়। তিনি পত্রের জবাবে আরেকখানা পত্র লিখলেন। জানালেন নূর মহম্মদকে, "পুত্র সব পিতার কাছেই সমান ভালোবাসার। আমার পুত্রের অভাবে আমি বুঝতে পারছি আপনার পুত্রের জন্য আপনার হৃদয়ে কতটুকু ভালোবাসা রয়েছে। আমি সে ভালোবাসায় হাত বাড়াতে চাই না। আপনার পুত্রকে সাজা দিলে আমার প্রিয় পুত্রকে ফিরে পাবো না কোনোদিনই। তাছাড়া নাদির মহম্মদ জেনে শুনে কোনো অপরাধ তো করেনি। বেঁচে থাক আপনার নাদির। নাদিরের মধ্যেই বেঁচে থাক আমার চন্দ্র।"

অনেক আদর যত্ন করে ফিরিয়ে দিলেন নাদিরকে নূর মহম্মদের কাছে। পিতার মন পুত্রের মূল্য বুঝলো। বড় ভালোবাসার জয় হল। এ জয় চিরকালের।

● সমসের গাজীর কাহিনী

রামমাণিক্যের পর রাজা হলেন দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য। তারপর জগৎমাণিক্য আর ধর্মমাণিক্য রাজা হলেন ত্রিপুরার। এরপরই এলো বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকাল।

জয়মাণিক্যের ছোটো ভাই হরিধন ঠাকুর ঢাকার নবাবের সনদ পেয়ে বিজয়মাণিক্য নাম নিয়ে রাজা হলেন ত্রিপুরার। ঢাকার নবাবের সঙ্গে কথা হল তাঁর, তাঁকে নিয়মিত হাতী পাঠাতে হবে ত্রিপুরা থেকে। কিন্তু ত্রিপুরার বনে তখন অনেক কমে এসেছে হাতীর সংখ্যা। প্রয়োজন মতো মিলছে না হাতী!

ঢাকার নায়েব এ-সময় 'নাজিম নিবাইস মহম্মদ'। হোসেন কুলী খাঁ তার সহকারী। বাংলার নবাব তখন আলিবর্দী খাঁ।

হোসেন কুলী খাঁর সহায়তাতেই রাজা হয়েছিলেন বিজয়মাণিক্য। সেই হোসেন হাতী চেয়ে পাঠিয়েছেন। চারদিক অন্ধকার দেখলেন বিজয় মাণিক্য, হাতী পাঠাতে না পেরে।

এদিকে রাজ্যেও চলতে লাগলো নানা রকমের অসন্তোষ। প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল।

এরই মধ্যে অন্য একটি ঘটনা ঘটে গেল। 'দক্ষিণ শিক' অঞ্চলে বাস করতো এক গরিব মুসলমান। নাম ছিল তার সদা গাজী। মাঠে চাষ করছেন একদিন সদা গাজী। হঠাৎ লাঙ্গলের ফলায় ঠন করে কি একটা লাগলো যেন। বলদ দু'টোকে থামিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন সদা গাজী। অবাক হলেন তিনি। এ যে জ্বল্‌জ্বলে উজ্জ্বল এক মুক্তো।

সদা গাজী হাল গুটিয়ে মুক্তো নিয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন। দেখলেন উল্টে-পাল্টে সেই দামী পাথরটা। এত বড়ো এই মুক্তোর দাম তো কয়েক লক্ষ টাকা। সাধারণ মানুষের ঘরে মুক্তো রাখা ঠিক নয়। সদা গাজী ভাবলেন, কোনো বড়ো মানুষকে এই মুক্তো দিয়ে তার অনুগ্রহ পাওয়াই বড়ো লাভ।

'চাকলে রোশনাবাদের' অধিবাসী জগৎমাণিক্যকে সদা গাজী দান করলেন সেই মুক্তো। তার বিনিময়ে তিনি হতে পারলেন দক্ষিণ শিকের জমিদার। গরীব কৃষক সদা গাজী এ-ভাবে হলেন জমিদার।

সদা গাজীর দিন সুখে কাটলো। তারপর জমিদার হলেন তাঁর ছেলে 'নাদির মুহম্মদ'। কয়েকটি ছেলে নাদিরের। ছেলেরা সব নানা পুঁথি পড়ে, শাস্ত্র পড়ে। তারা হবে পণ্ডিত, অনেক বড়ো।

জমিদার বাড়ির খুব কাছে বাস করে এক গরীব ছেলে। তার নাম সমসের। বড়ো গরিব তারা! পড়ার বই নেই, রাতে আলো জ্বালবার নেই কোনো সম্বল। নানা অভাব তাদের। কিন্তু সমসেরের ইচ্ছে সেও পড়াশোনা করবে, খুব বড়ো হবে।

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। সমসের একদিন জমিদার বাড়ি গেল ভয়ে ভয়ে। জমিদার নাদ্বিরের কাছে জানালো তার মনের কথা। প্রার্থনা জানালো যদি নাদির অনুমতি দেয় তো সে থাকে জমিদার বাড়িতেই, তাঁর ছেলেদের পুঁথি পড়ে পড়াশোনা চালায়।

নাদির গরিব ছেলের কথায় রাজী হলেন। সমসেরের পড়াশোনা থাকা খাওয়ার সমস্যা মিটলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমসের জমিদারের ছেলে 'ছাতুল্লা' আর 'বাতুল্লাকে' ছাড়িয়ে অনেকদুর এগিয়ে গেল।

সমসেরের বিদ্যাবুদ্ধি দেখে তাকে খুব ভালো লাগলো নাদির মহম্মদের। তিনি তাকে নিযুক্ত করলেন বাঁশপাড়া কাছাড়ির তহশীলদার। সেই থেকেই ফিরে গেল সমসেরের ভাগ্য।

একদিন বাঁশপাড়াতে এলেন এক বিখ্যাত ফকির। নাম তাঁর 'গদা হোসেন'। সমসের একদিন দেখা করলো গদা হোসেনের সঙ্গে। গদা হোসেন বললেন, "সমসের, তুমি রাজা হবে।" এই বলে তিনি তাকে উপহার দিলেন এক দৈব ঘোড়া আর এক দৈব তলোয়ার।

এ ঘোড়া কেউ চোখে দেখতে পায় না। কোনোদিন ক্লান্ত হবে না এ ঘোড়া, কারো অস্ত্রের আঘাতে কাবু হবে না সে কোনোদিন। আর দৈব তলোয়ার হাতে থাকলে কোনো যুদ্ধে হবে না তার পরাজয়।

কিছুদিন কাটলো এভাবে। সমসের ভাবলো দৈব ঘোড়া আর দৈব তলোয়ারের শক্তি একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। একটু দুঃসাহস করলো সমসের। নাদির মহম্মদের কাছে খবর পাঠালো তাঁর কন্যা 'দৈয়া বিবিকে' বিয়ে করবে সে।

নাদির এতদুর ভাবতে পারেন নি। তিনি চটে গেলেন খুব। গরীব নীচু বংশের ছেলে সমসেরের একি দুঃসাহস! সমসেরকে বেঁধে আনার জন্য সেনা পাঠালেন নাদির।

সমসের এ-জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। হঠাৎ করে এতো বড়ো একটা যুদ্ধ করা চলে না। সমসের এবারের মতো তার দৈব ঘোড়ায়

চড়ে পালিয়ে গেলে 'বেদরাবাদ'।

'বেদরাবাদ' পরগণায় কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে রইলো সমসের। কিন্তু দমে গেলো না মোটেই। তার সঙ্গী পেলো সেখানে বড়ো বীর 'ছাতু গাজীকে'। ছাতু গাজীর সহায়তায় এবারে আগে থেকেই যুদ্ধের ছক কষে নিলে সমসের। কিছু বাছা বাছা যুবককে দলে টানলো তারা। তাদের খুব ভালো করে যুদ্ধবিদ্যাটা শিখিয়ে নিলে।

এবারে অভিযান আরম্ভ হলো সমসেরের। সহজেই তারা আবার দক্ষিণ শিক দখল করে নিলো। আবার দক্ষিণ শিকের জমিদার হলো সমসের।

জমিদার নাদির সমসেরের বীরপনায় মুগ্ধ হলেন। তাঁকে দক্ষিণ শিকের জমিদার বলে মেনে নিলেন তিনি। এবারে সমসেরের ইচ্ছে পূর্ণ হল। দৈয়া বিবিকেও দান করলেন নাদির।

বড়ো হবার জোরদার ইচ্ছেই মানুষকে বড়ো করে তোলে ধীরে ধীরে। সমসের একেবারে ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে লড়তে চাইলেন। কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজা এ-কথা জানতে পেরে আগে থেকেই সেনা পাঠিয়ে দমন করলেন তাকে।

তিন বছর পরে সে মেহেরকুল পরগণা ইজারা পেলে। সমসের হাতী ধরার প্রতিযোগিতায় নামলে এবারে। আর বারো হাজার টাকা মাসোহারার বদলে রোশেনাবাদের জমিদারী প্রার্থনা করলেন সে নবাব হোসেন কুলী খাঁর কাছে।

এদিকে হোসেন শাহের আহ্বানে ত্রিপুরার মহারাজা বিজয়মাণিক্য ঢাকা রওনা হলেন। পথে দৈবাৎ তিনি মারা গেলেন।

ইন্দ্রমাণিক্যের ছোটো ভাই কৃষ্ণমাণিক্য আশ্রয় নিয়েছিলেন হেরম্ব রাজ্যে। বিজয়মাণিক্যের পর তাঁরই ত্রিপুরার রাজা হবার কথা। প্রজাদের আহবানে তিনি আসছিলেন ত্রিপুরায়। পথের মাঝে সমসের তাকে বাধা দিলেন।

সমসেরের জয় হল যুদ্ধে। উদয়পুর দখল করে নিলো সে। সমসেরই

হলো ত্রিপুরার রাজা।

রাজনীতির বুদ্ধিও ছিল সমসেরের খুবই। ত্রিপুরার জনগণের মন জয় করা চাই তার! রাজ্য জুড়ে খুঁজে বার করলে ধর্মমাণিক্যের নাতি বনমালীকে। তার নতুন নামকরণ করলেন লক্ষ্মণমাণিক্য। তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে সমসের শাসন করতে লাগলেন ত্রিপুরা।

এ সময় বঙ্গে রাজত্ব করছেন মীরজাফর। তিনি হাতী চেয়ে পাঠালেন ত্রিপুরার রাজার কাছে। সমসের জানালেন, "'খেদা' তৈরী হচ্ছে, হাতী ধরা হবে এবারে।" এ সংবাদেই সন্তুষ্ট রইলেন মীরজাফর।

রাজকোষে অর্থ নেই। সমসের বিপদে পড়লে। ভাবতে লাগলে, কিভাবে রাজকোষ পূর্ণ করে তুলবে আবার টাকা কড়ি দিয়ে।

কোনো উপায় না দেখে ডাকাতির পথ বেছে নিলো সমসের। নানা জায়গায় লুট করে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলে। এতে তার অপযশ বাড়তে লাগলো।

সমসের জানতে পেরেছে চাটগাঁয়ের জ্বালামুখী কালীর মন্দিরে আছে অনেক ধনরত্ন। মায়ের গায়েও আছে অনেক রত্ন অলংকার। সমসের রাতের আঁধারে সদল বলে চললো জ্বালামুখীতে।

ঘন আঁধার রাত। চারদিক একেবারে নীরব। বুনো গাছের পাতার ছায়ায় সে আঁধার আরো ঘনিয়েছে। মায়ের মন্দিরে জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। আকাশে অনেক দূরে দূরে তারা হাসছে একটি দুটি। বুনো বিপদের পথ। সমসের অসীম সাহসে এগিয়ে চলেছে সে পথে।

ভয়ানক বিভীষিকা দেখতে লাগলো এবারে সবাই। দেখলো তারা ভূত প্রেত পিশাচের দল নাচতে নাচতে এসে তাদের ঘিরে ফেলছে। আকাশে থেকে থেকে আগুনের বৃষ্টি ঝরে পড়ছে চারদিকে। মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, বইছে প্রবল এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। বাঘ সিংহ সব বন থেকে লাফিয়ে আসছে তাদের দিকে।

এতো সব বিপদ মাথায় নিয়ে আর এগুতে সাহস পেল না সমসেরের দল। কালীমন্দির লুণ্ঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করলো তারা।

ত্রিপুরার রাজবংশের কৃষ্ণমাণিক্য, হেরম্বরাজ আর মণিপুরের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে, সমসেরকে পরাজিত করে ত্রিপুরা অধিকার করতে চাইলেন। কিন্তু তার এ চেষ্টা সফল হল না।

বাংলার নবাব তখন মীরকাশিম। রাজা সমসেরের অত্যাচারের সংবাদ তাঁর দরবারে পৌঁছলো গিয়ে। কৃষ্ণমাণিক্যও মুর্শিদাবাদ গিয়ে সব জানালেন নবাবকে।

মীরকাশিম ঘোষণা করলেন, কৃষ্ণমাণিক্যই আজ থেকে ত্রিপুরার রাজা, সমসের নয়। সমসেরকে বন্দী করার জন্য তিনি সেনা পাঠালেন ত্রিপুরায়। বন্দী হলো সমসের। নবাবের তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে সমসেরকে উড়িয়ে দেওয়া হল আকাশে।

● কৃষ্ণমাণিক্য ও লেফটেন্যাণ্ট মথি

বেশীদিন রাজত্ব করতে পারলেন না কৃষ্ণমাণিক্য। 'চাকলে রেশেনাবাদের' খাজনা নিয়ে মৌজাদারের সঙ্গে বিরোধ বাঁধলো। ফৌজদার আবেদন জানালেন বাংলার নবাবের কাছে। বাংলার নবাব তখন খেলার পুতুল মাত্র ; ইংরেজরাই হর্তাকর্তা।

বাংলার বড়লাট ভ্যান্সিটার্ট পাঠালেন লেফটেন্যাণ্ট মথিকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। মাত্র দুশ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন মথি।

ত্রিপুরী সেনারা কৈলাগড়ে দুর্গ গড়লো। তাদের সৈন্য সংখ্যা সাত হাজার, সঙ্গে তোপ। যুদ্ধে জয়ী হ'তো ত্রিপুরী সেনা। কিন্তু তাদের মনে ভীষণ এক ভয় ধরিয়ে দিল শত্রুরা। রটনা হয়ে গেল, ইংরেজ সেনার সংখ্যা অনেক এবং তাদের তোপের মুখে ত্রিপুরী সেনারা দাঁড়াতে পারবে না কিছুতেই। নকল মনগড়া ভয়ে ত্রিপুরীরা পালাতে লাগলো হঠাৎ দলে দলে। এ যেন দ্বিতীয় এক পলাশী।

ত্রিপুরার মহারাজের পরাজয় রোধ করা গেল না। 'লিক' সাহেব

হলেন ত্রিপুরার প্রথম 'রেসিডেন্ট'। বন-পর্বত ঘেরা পার্বত্য ত্রিপুরা রইল মহারাজের শাসনে। রাজধানী হল তার পুরানো আগরতলা।

কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর ছেড়ে 'পুরাতন আগরতলায়' চলে গেলেন। ত্রিপুরার সুন্দর সমতল অঞ্চল ইংরেজ শাসনে রইল। রাজধানী হল উদয়পুর।

● কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মৃত্যু কাহিনী

কৃষ্ণমাণিক্যের পর তাঁর স্ত্রী জাহ্নবী দেবী কিছুদিন রানী ছিলেন ত্রিপুরার। এরপর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসলেন পর পর রাজধরমাণিক্য, দুর্গামাণিক্য এবং রামগঙ্গামাণিক্য। রামগঙ্গা মাণিক্যের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য।

কৃষ্ণকিশোর বড়ো ধর্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। প্রজারা খুব সুখে ছিল তাঁর শাসনকালে।

একদিন একটি ঘটনা ঘটলো মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের জীবনে। এক রাতের ঘটনা।

জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাজপ্রাসাদের চারদিকে, বনে বনে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর একলা বসে আছেন বনের প্রান্তে, প্রকৃতির কোলে। দুধের মতো জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। রাতজাগা পাখীগুলো ডাকছে মাঝে মাঝে। বুনো ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে বাতাসে।

জীবনের কথা ভাবছেন বসে কৃষ্ণকিশোর। কেনই বা জন্ম আর কেনই বা মৃত্যু। জনম মরণের মাঝখানে কয়েক বছরের এই হাসি খেলার মানে কি? এ কার খেলা? এমনি সব ভাবনা এসে কাতর করে তুলতো কৃষ্ণকিশোরকে।

আবছা আলো-আঁধারে হঠাৎ চন্দনের গন্ধে ভেসে গেল আশপাশ। সামনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন তিনটি ছায়ামূর্তি। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন কৃষ্ণকিশোর। গৈরিক পোশাকে সেজে তিনজন সন্ন্যাসী। জ্যোতি বেরিয়ে আসছে তাঁদের শরীর থেকে।

তিন সন্ন্যাসী মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের সামনে এলেন ধীরে ধীরে। মধুর কণ্ঠে বললেন তাকে, "পূর্বজন্মের কথা মনে করো কৃষ্ণকিশোর। তুমি এই রাজসুখ ভোগের জন্য নও। তোমার জীবন ত্যাগের জন্য, সাধনার জন্য। তুমি নিজেকে জানবে, তপের প্রভাবে, এরকম কথাই তো ছিল।" একথা বলেই সন্ন্যাসীরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণকিশোর একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভাবছেন শুধু, একি স্বপ্ন না সত্য। এ-ঘটনার পর থেকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের জীবনে বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। রাজকাজে মোটে মন নেই তাঁর, সর্বদাই কি এক ভাবনায়, জগৎ থেকে অনেক দূরে, কোথায় যেন তাঁর মন পড়ে থাকে।

এভাবে গেল কিছুদিন। গ্রীষ্ম গিয়ে এলো বর্ষা। বর্ষার ঘনঘটায় আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে। মহারাজ চলেছেন কুঞ্জবনের পথে। হঠাৎ কড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো ইন্দ্রের বজ্র আকাশ ফুঁড়ে। এই বজ্রাঘাতেই প্রাণ হারালেন মহারাজ কৃষ্ণকিশোর। তিনি চলে গেলেন জীবনের সাধনা করতে, পরবর্তী জীবনে।

● রাধাকিশোরের বিজ্ঞান ও সাহিত্যপ্রীতি

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর রাজা হলেন ঈশানচন্দ্রমাণিক্য। তারপর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসলেন বীরচন্দ্রমাণিক্য! মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের ছেলের নাম রাধাকিশোরমাণিক্য।

মহারাজ রাধাকিশোর ভালবাসতেন কাব্য, শিল্প সাহিত্য। তাঁর রুচিবোধ ছিল খুব উন্নত।

ত্রিপুরার সঙ্গে বঙ্গের যোগাযোগ অনেক বেড়েছিল রাধাকিশোরের সময়েই। বাংলার রাজধানী কলকাতাতে আয়োজন হয়েছিল মহারাজের সংবর্ধনার। বঙ্গের মানুষ রাধাকিশোরের মহানুভবতাতে মুগ্ধ হয়েছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ খুব ভালবাসতেন রাধাকিশোরকে। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিলেন রাধাকিশোর। সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

সভামণ্ডলের উঁচু মঞ্চে দুটি আসন পাতা ছিল। একটিতে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যটিতে মহারাজের বসবার ব্যবস্থা। কিন্তু কবিকে সম্মান দেখাতে গিয়ে মহারাজ মঞ্চের ঐ উচ্চ আসনে রবীন্দ্রনাথের পাশে বসলেন না। মহারাজ বসলেন নীচে এসে, সর্বসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বললেন তিনি, "আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত মাত্র, এ উচ্চ মঞ্চে আমার স্থান নয়।"

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বসেছে বিজ্ঞানের প্রদর্শনী। রবীন্দ্রনাথ আর জগদীশচন্দ্র বসু প্রদর্শনী দেখতে আমন্ত্রণ জানালেন মহিম ঠাকুরকে। মহারাজ রাধাকিশোর জানতে পারলেন সে কথা। তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হলেন গিয়ে সেখানে। তিনিও বিজ্ঞান

ভালবাসতেন। আচার্য জগদীশ বসুকে বললেন তিনি, "বাংলা ভাষায় আপনার আবিষ্কার বিষয়ে প্রকাশিত লেখাগুলো আমি পড়েছি। বিজ্ঞান আলোচনায় আমি আনন্দ পাই। আমিও আপনার একজন ছাত্র।"

কলকাতার 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' তৈরী হবার সময় মহারাজ দান করলেন দশ হাজার টাকা। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র যখন বিলাতে তখন তাঁর টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কিছু টাকা না হলে আর তিনি সেদেশে থাকতে পারছেন না। মহারাজ জানতে পারলেন একথা। তাঁর হাতেও তখন তেমন টাকা নেই। আছে শুধু রাজকুমার বীরেন্দ্রকিশোরের ভাবী বধূর জন্য তৈরী করা কিছু সোনার অলংকার। সেই অলংকারই বিক্রি করলেন মহারাজ। তিনি জগদীশ বসুকে বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। খুব গোপনে তিনি এই সাহায্য করেছিলেন, কেউ জানতে পারেন নি তখন। কাছের লোকদের জানিয়েছিলেন তিনি এ বিষয়ে, "বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু'এক পদ গয়না নাইবা হল। তার বদলে আচার্য জগদীশ সাগর পার থেকে যে অলংকারে ভারত মাতাকে সাজিয়ে দেবেন তার তুলনা কোথায়?"

বাংলার বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছিলেন দেশবাসীকে জাগাতে, দেশের পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়তে। সেই মহাকবি হেমচন্দ্র অন্ধ হয়ে গেলেন হঠাৎ। মহারাজ রাধাকিশোরকে ভীষণ চিন্তিত করলো এ-সংবাদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁর মাধ্যমে কবি হেমচন্দ্রকে প্রতিমাসে তিরিশ টাকা করে মাসোহারা দেবার বন্দোবস্ত করলেন গোপনে। এমনি ছিল তাঁর হৃদয়।

● আধুনিক রাজা বীরেন্দ্র ও বীরবিক্রমকিশোর

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের জন্ম ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আর মৃত্যু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। মাত্র পনেরো বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। এ সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক কাজ করে গিয়েছেন ত্রিপুরার জন্য।

তাঁর সময়েই তৈরী হয়েছে আধুনিক আগরতলা সহর। আর তৈরী হয়েছে সহরের বিখ্যাত দুর্গামন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির এবং কুঞ্জবন প্রাসাদ।

বীরেন্দ্রকিশোরের সময় বাংলার গভর্নর লর্ড কার্মাইকেল এবং লর্ড রোনাল্ডসে আগরতলা আসেন। তাঁদের নামে হাওড়া নদীর সেতুটির নাম হয় কার্মাইকেল ব্রীজ আর সেতুর সঙ্গের রাস্তাটার নাম হয় রোনাল্ডসে রোড।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর রাজা হন বীরবিক্রম কিশোর। তাঁর জীবনও কর্মমুখর।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় যে সভা হয়েছিল তাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশী বছরের জন্মদিনে তিনি আহ্বান করেছিলেন 'রবীন্দ্রজয়ন্তী দরবার'। কবিকে সম্মানিত করে তিনি দান করেছিলেন 'ভারত ভাস্কর' উপাধি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদেশে যান। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হল মুসোলেনীর সঙ্গে আর পরিচয় হয়েছিল হিণ্ডনবার্গের সঙ্গে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বীরবিক্রম কুমিল্লায় উদ্বোধন করেন "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের"।

॥ শেষ-কথা ॥

পুরানো সে দিনগুলো আজ আর নেই, নেই সেই পুরানো দিনের রাজারাও। সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরার পাহাড়গুলো। বয়ে চলেছে গোমতী আর মনু নদীর জলের ধারা। বংশ পরম্পরায় রয়েছে সেই পাহাড়ী মানুষগুলো—ত্রিপুরী, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, চাকমা, হালাম, ডারলং। রয়েছে 'রাজমালা' রাজাদের কাহিনী। 'রাজমালা' বাংলা ভাষার কবিতায় লেখা প্রথম ইতিহাসের বই। গল্পের সঙ্গে ইতিহাস মিলেছে এসে এ বইতে।

পলাশীর যুদ্ধে হারলেন সিরাজ, ভারতের স্বাধীনতার সূর্য ডুবলো, ইংরেজ হল ভারতের শাসক। সে-কথা জানি আমরা। রাজা হয়ে ইংরেজরা ভাবলো, ত্রিপুরাকেও আমাদের শাসনে নিয়ে আসি। কিন্তু ত্রিপুরা মাথা নোয়ালো না। কোনোদিন স্বাধীনতা হারালো না এই ছোটো রাজ্যটি। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর-মাণিক্য থেকে সব মহারাজাই ইংরেজদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন, ব্যর্থ হল বাংলার মুসলমান সুলতানদের অপচেষ্টাও।

কৃষ্ণ মাণিক্যের সময় লেফটেন্যান্ট ম্যাথু চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরায় অভিযান চালালেন। সমতল ত্রিপুরায় উড়লো ইংরেজ পতাকা। কিন্তু স্বাধীন রইল পার্বত্য ত্রিপুরা। অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতে যোগ দিল ত্রিপুরা।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের কালে জন্ম নিয়েছিল আধুনিক ত্রিপুরা। তিনি রাজা ছিলেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ত্রিপুরার সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছুতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলো বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে। বীরচন্দ্রমাণিক্যের পর রাজা হলেন রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর আর বীরবিক্রমকিশোর।

বীরবিক্রমকিশোরই ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা। তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ মে। তিনিই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতে যোগ দেবে।

সেদিন ছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী, মহারাজকুমার কিরিটবিক্রমের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লীতে চুক্তিপত্রে সই

করলেন। এভাবে তেরশ বছরের স্বাধীন ত্রিপুরা গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা মেনে নিল, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ নিজেরাই নিজেদের সরকার গঠন করতে পারে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি 'সি' শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত হল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এ-রাজ্য হল একটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য। এর পর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই ত্রিপুরায় জনসাধারণের ভোটে গঠিত হল রাজ্য বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী থেকে ত্রিপুরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। ১৯৭২-এর নির্বাচনে জয়ী হল কংগ্রেস দল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত। এরপর জনতা আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল মিলে সরকার গঠন করলো ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত। এই মন্ত্রীসভা বেঁচে ছিল মাত্র ৯৫ দিন। এরপর কিছুদিন ত্রিপুরা ছিল রাষ্ট্রপতির শাসনে। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আবার নির্বাচন হল। এ নির্বাচনে ষাট সদস্যের বিধান সভায় বিপুল ভোটে জয়ী হল সি. পি. আই (এম) দল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরায় আবার নির্বাচন হয়েছে। এ নির্বাচনেও সি. পি. আই (এম) দলই জয়ী হয়েছে। আবার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বেই চলেছে ত্রিপুরার গণশাসন ব্যবস্থা। সুদূর ভবিষ্যৎ ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরার ভাগ্যে ঘটিয়ে দেবে হয়তো আরো কতো পরিবর্তন!
